

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০২১

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি-

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের পত্রিকা **'চেতনা'** ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০২১

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমন্ডলী- প্রসেনজিৎ, অভিষেক, অনিমেষ, পথিক এবং দেবস্মিতা।

যোগাযোগ:

ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com

টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- ত্রিশ টাকা

ওয়েবসাইট-

https://rationalists.wixsite.com/chetona

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ:

কবিতা:

গল্প:

সম্পাদকীয়

জানুয়ারি সংখ্যার ব্যপক জনপ্রিয়তা আমাদের অদম্য প্রেরণা জুগিয়েছে। যুক্তিবাদী বন্ধুদের লেখালেখির অভ্যাস ধরে রাখার জন্য যে প্রয়াস আমরা শুরু করেছি তা চলতে থাকুক এভাবেই। নতুন ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই পত্রিকা মুক্তচিন্তকদের অর্থাৎ আমাদের, তাই এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও আমাদের ওপরই বর্তায়। মাসে একটা করে লিখুন যেমনটি পারেন, দশ লাইন লিখতে পারলেও চলবে, তাই পাঠিয়ে দেবেন। ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা নেবেন। ফেব্রুয়ারি মাসেই শহীদ হন মুক্তচিন্তক জিওনার্দো ব্রুনো এবং অভিজিৎ রায়, দুজনকেই গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ।

অনন্তের শহীদ

-কুসুমকলি দে

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬০০

সাত বছর কারারুদ্ধ থাকার পর আজ তাঁর চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ করার দিন। ইতালির Campo De'Fiory স্কোয়ার। অগণিত মানুষের সমাগম হয়েছে আজ সেখানে। সকলের মধ্যে আজ উৎকণ্ঠা,কত বড় একজন আসামির সাজা হবে আজ! গির্জার ধর্মযাজকদের দয়ার শরীর, তারা নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতম অপরাধীদের ও ক্ষমা করে দেন। চুরি,ডাকাতি,খুন খারাপি যাই করে থাকুক না কেন,সকল অপরাধই ক্ষমারযোগ্য শুধু যদি শেষে দোষীরা নিজেদের দোষ শিকার করে গির্জা কর্তৃপক্ষের কাছে মাপ চেয়ে নেয়। কিন্তু এই তরুণ অসম্ভব জেদি, কিছুতেই তাকে নিজের অবস্থান থেকে টলানো গেল না। রোমান ইনকুইজিশনের ইনকুইজিটর কার্ডিনাল বেলারমাইন তাকে তাঁর ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন, কিন্তু সে অস্বীকার করে। ১৬০০ সালের ২০ জানুয়ারি পোপ ৮ম ক্লেমেন্ট তাকে একজন ধর্মদ্রোহী বলে তাকে আখ্যায়িত করেন ও তাঁকে মৃত্যুদন্ডের রায় দেন। রায় শুনে আসামি বিচারকদের শাসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আপনারা হয়তো আমার সাথে হেরে যাবার ভয়ে আমার বিরুদ্ধে এই রায় দিয়েছেন। আমি এটি গ্রহণ করলাম।" তরুণটির নাম জিওর্দানো ব্রুনো। তাঁর অপরাধ রোমের ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধাচারণ করা। বাইবেলে বর্ণিত মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা মানতে অস্বীকার করেছিলেন। বাইবেলের বর্ণনার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা সেই প্রথম ব্যাক্তিই ব্রুনো। তাঁর মত ছিল মহাবিশ্ব একাধিক ও তার কোনো কেন্দ্র নেই। নিষিদ্ধ করে দেওয়া কোপারনিকাসের মত-পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, সমর্থন করেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন। তাই মৃত্যুদণ্ড। সকলের চোখের সামনে পিছমোড়া অবস্থায় প্রথমে তার জিভ কেটে ফেলে তারপরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল।



এই নৃশংসতার মাধ্যমে গির্জা কর্তৃপক্ষ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যারা যারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবে, ধার্মিক মতাদর্শের বিরোধিতা করবে তাদের সকলের এমন ভাবে কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হবে। এমন এক রাজত্ব যেখানে একছত্র অধিপত্যে সম্ভব। অন্যায় ভাবে মানুষকে পেশীর বল, কখনও ঈশ্বরের ভয় দেখিয়ে উৎপীড়ন করা সম্ভব হবে।

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্তব্ধ করা যায়নি বিজ্ঞানের গতিকে। এমন কোন কারাগার, কোন শাসকই তৈরি করতে পারেনি যা বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে, যুক্তিকে রুদ্ধ করতে পারে। ব্রুনোর মৃত্যুর পর তার কাজকে অনুসরণ করে এগিয়েছেন বহু অনুসন্ধিৎসু, কৌতূহলী মানুষ। সেই কৌতূহল,অদম্য সাহসই চালিত করেছে আমাদের এই বিশ্বের কত গোপন রহস্য উদঘাটন করতে। আজ বিজ্ঞানের কত সুবিধা আমরা উপভোগ করছি কিন্তু এই পথচলার শুরুটা ছিল এমনই কঠিন, প্রতিপদে বিরোধিতা।

এবার প্রশ্ন আসে মনে এই একবিংশ শতাব্দীতে এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য ঠিক কী? আমরা হয়তো আজ আধুনিক হয়েছি। গোটা পৃথিবী জুড়ে আজ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় আমরা কী সত্যিই একাত্ম হতে পেরেছি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের সাথে। সমাজের সর্বস্তরে কী পৌঁছতে পেড়েছে যুক্তির আলো? অনেক শিক্ষিত মানুষের চিন্তাভাবনার মধ্যেও চোখে পড়ে অন্ধবিশ্বাস, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা,কারণ সত্যেকে অনুধাবন করা অনেক কঠিন। সেই তুলনায় অন্য কারুর চিন্তাকে নিজের চিন্তা বলে চালানো সহজ।বিজ্ঞান অনেক বেশি নমনীয়।বিজ্ঞানের চোখে সকলে সমান। কোন ভুল ত্রুটি থাকলে তা শুধরে নেওয়া হয়েছে। ধর্মমত আর রাজনীতিক মতের সত্যতা প্রমাণ করা অসাধ্য।প্রমাণের অভাবে আসে আক্রোশ আর উত্তেজনা, মতবিরোধের

ফল হয় শত্রুতা। রাজশেখর বসু তাঁর 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' রচনাটিতে লিখেছেন -"যদি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সমাজের সকল মানুষ প্রয়োগ করতে শেখেন তবে কেবল ভ্রান্ত সংস্কার দূর হবে না, ধর্মান্ধতা ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ও অবসান হবে।"
সেইদিন তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে পারব আমরা ব্রুনোকে। ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন ব্রুনো। বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম শহীদ।

উই আর স্টার স্টাফ

-সৌরভ দেবনাথ

রাত ৯টা বেজে গেছে। ধানক্ষেতের মাঝখান থেকে একটা ঢালাই রাস্তা দুটো গ্রামের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। সেই রাস্তা ধরে শঙ্খ আর কুশল ফিরছে তাদের বন্ধু পুষ্পকদের বাড়ি থেকে। গ্রাম বললেও এই গ্রামের প্রায় সব লোকের কাছেই স্মার্টফোন আছে। নেই শুধু বিজ্ঞানমনস্কতা। কুশল তার ফোনে টাইপ করে চলেছে কিছু একটা। সেই কিবোর্ডের টকাটক শব্দ শুনতে পাচ্ছে শঙ্খ। পুষ্পকদের বাড়িতে আজ বেজায় তর্ক হয়েছে পুষ্পকের সাথে। পুষ্পকের কোন দাদু নাকি জ্যোতিষি। ভদ্রলোক নাকি পুষ্পককে বুঝিয়েছেন যে ধর্ম আর বিজ্ঞানের কোনো তফাৎ নেই। প্রাচীন ঋষিরা অনেক কিছু জানতো বিজ্ঞানের ব্যাপারে। বিবেকানন্দ নিজেও সে কথা বলেছেন এমন যুক্তি টেনে বিজয়ী ভেবে নিল নিজেকে পুষ্পক। কুশল যথারীতি নিউট্রাল। সে মজা নিয়ে গেছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে শঙ্খ দাঁড়িয়ে পড়ল। আজ অনেকগুলো তারা দেখা যাচ্ছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল সে। কুশল এগিয়ে গেছিল মোবাইলে টাইপ করতে করতে। পেছন ফিরে দেখল শঙ্খ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কুশল শঙ্খের কাছে গিয়ে বলল "বাড়ি চল অনেক রাত হলো।" কুশল সে কথায় কান না দিয়ে "বললো আজকের দিনটা কি জানিস?"

-“১৭ ই ফেব্রুয়ারি।”

-"হ্যাঁ। কিন্তু আজকের দিনটার বৈশিষ্ট্য কি?”

-“জানিনা ভাই।”

-"আজ হলো এমন একজন মানুষের মৃত্যুদিন যাকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথম শহীদ বলা হয়। আজ জিয়র্দানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।"

-“এই জিয়র্দানো ব্রুনো কে?”

-“আমরা সবাই গ্যালিলিওর কথা জানি, কোপারনিকাসের কথা জানি। কিন্তু ব্রুনোর কথা আমরা শুনিনা। আজ যখন পুষ্পক তার দাদুর বলা বুলি আওড়ে বলল বিজ্ঞান আর 'ধর্ম একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ' তখনই বিজ্ঞানের জন্য যাঁরা প্রাণ দিলেন তাঁদের আত্মবলিদান নস্যাৎ করে দিল সে।

-“আচ্ছা শঙ্খ একটা কথা তো মানবি যে স্পিরিচুয়ালিটি বলে কিছু হয়?”

-“আচ্ছা কুশল, তুই আমাকে স্পিরিচুয়লিটির সংজ্ঞাটা বল তো? ইউটিউবে যে বাবাজিরা সং সেজে স্পিরিচুয়লিটির কথা বলে সেটা? যারা অপবৈজ্ঞানিক কথা বলে তারা? যারা ব্যাকগ্রাউন্ডে ওম সাউন্ড চালিয়ে জ্যোতিষচর্চা করে তাদের স্পিরিচুয়ালিটি?”

-“তুই বলছিস বটে কিন্তু তাঁরা যদি ঠিক নাই হবে তাহলে তাঁদের এত ভক্ত কেনো হবে?”

-“শোন তবে একটা কথা বলি। প্রথমত আমার কাছে স্পিরিচুয়ালিটি হলো রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার যে অনুভূতি। যত দূরে তারা আমি দেখি তারা তত পুরনো। কার্ল সাগান যে বলে গেছেন 'উই আর স্টার স্টাফ' তার মানে আমার শরীরের প্রতিটা উপাদান তারাদের থেকে জন্ম নিয়েছে। আমার শরীরের প্রতিটা হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম পরমাণুর বয়স মহাবিশ্বের বয়সের সমান। আমি রাতের আকাশের দিকে তাকালে এমন অনেক তারা দেখতে পাচ্ছি যেগুলোর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে অনুভূতিগুলো এটাই আমার কাছে স্পিরিচুয়ালিটি।

আর তুই যে বলছিস যে সেইসব স্পিরিচুয়াল বাবাজিদের এত ভক্ত কেনো, আমাকে বল তো যদি গণবিশ্বাস বিজ্ঞান হতো তাহলে গ্যালিলিও, কোপারনিকাস এনারাও তো ভুল। আজও মহাবিশ্ব পৃথিবীকেন্দ্রিক হতো। তা তো নয়?"

-"হুম। ঠিকই বলেছিস তুই। আচ্ছা এই জিয়র্দানো ব্রুনোর ব্যাপারে তুই যা জানিস একটু বল তো"

-"ইউরোপের চার্চের কিরকম নিপীড়ন ছিল সে তো কিছু কিছু জানিস। ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি সবই একসাথে ছিল। চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই মৃত্যুদণ্ড। ষোলো শ শতকে কোপারনিকাস তাঁর বইতে লিখলেন মহাবিশ্ব সৌরকেন্দ্রিক। কিন্তু ধর্মের ষাঁড়গুলো কেনো মেনে নেবে? তাদের ধর্মের ওপর নাকি অপমান হয়েছে। কিন্তু একজন পাদ্রী ছিল যে কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের সমর্থন শুধু নয় তা প্রচারও করতো। এমনকি একধাপ এগিয়ে বলতে শুরু করলো মহাবিশ্ব অসীম। দূরের যে তারাগুলো তারাও এক একটা সূর্য। তাদের চারপাশে আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহ ঘুরছে। আমাদের সূর্য সেই তারাদের মতোই একটা তারা। তখনকার দিনের চার্চের নিষিদ্ধ বিজ্ঞানের বইও সে লুকিয়ে পড়ত।"

-"এখানে একটা কথা বলতে চাই যে তার কাছে তো কোনো প্রমাণ ছিলনা?"

-"না। কারণ টেলিস্কোপ তখনও আসেনি। অ্যাস্ট্রোনমাররা খালি চোখেই দেখতো ধৈর্য্য ধরে। ব্রুনোর সব কথা হয়তো ঠিক নয়। সে তার সময়ের ফসল। কিন্তু তার কৃতিত্ব এখানেই সে বৈপ্লবিক একটা ভাবনা ভেবেছিল। চার্চের ধরাবাঁধা গণ্ডির বাইরে বেরোতে চেয়েছিল। চার্চের সেটা সহ্য হবার কথা নয়। হয়ওনি। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে নিজের বক্তব্য রাখার সুযোগ পেল। সেখানে গিয়ে নিজের ভাবনার সব উজাড় করে দিতে চাইল। কোপারনিকাসের সমর্থনে বলতে চাইল। কিন্তু সেখানেও তাঁকে অপমানিত হতে হলো। সবাই বলতে লাগলো সে হেরেটিক বা অধার্মিক। আট বছর তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। অকথ্য অত্যাচার করা হতো তাঁকে। বলা হতো যাতে মেনে নেয় সে যা বলেছে সব ভুল। কিন্তু সে ছিল ব্রুনো। নিজের সিদ্ধান্তে অনড় অটল। ইনকুইজিশন নামক প্রহসন চললো। সেখানেও কার্ডিনাল তাকে ক্ষমা চাইতে বলল। কিন্তু ব্রুনো তার ভাবনা থেকে এক চুলও সরে দাঁড়াতে নারাজ। অবশেষে ষোল-শ খ্রিস্টাব্দে আজকের দিনেই রোমের ক্যাম্পো ডি ফিওরি স্কোয়ারে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয় ব্রুনোকে। রোমের জনগন সেদিন পুড়ে যেতে দেখেছিল এক অবিশ্বাসীকে। সবাই ভেবেছিল তাদের ধর্ম বুঝি রক্ষা পেল। কিন্তু তারপর আমরা সবাই জানি সত্যিটা কি। সবথেকে বড় কথা কি জানিস তো আমরা এতকিছু জানার পরেও বলব বিজ্ঞান আর ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। সত্যিই কি তাই? এখনকার দিন গুলোতে দেখ তো একবার বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুর রহমান এনাদের পরিণতি। আমাদের দেশেই নরেন্দ্র দাভলকার যিনি চেয়েছিলেন কুসংস্কার বিরোধী আইন আনতে তাঁকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হলো। এদেশে এখনও ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে মানুষ খুন হয়। এত কিছুর পরেও যদি বলো বিজ্ঞান আর ধর্ম একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ তাহলে এই মানুষগুলোর অপমান।"

এরকম একটা ঘটনা শুনে কুশলের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সে বলল "আচ্ছা আমাদের তবে কি করণীয়?"

-"আমরা যদি বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারি, সবসময় যদি বিজ্ঞানের প্রচার করি, কুসস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে পারি তাহলেই তাঁদের বলিদান বিফলে যাবেনা। তুই, পুষ্পক তোরা যেদিন তোদের হাতের জ্যোতিষ রেকমেন্ডেড আংটিগুলো খুলে ফেলতে পারবি, যেদিন মনের সব ভয় দূর করে জাত, ধর্ম, বর্ণ ভুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন থেকে বলতে পারবি 'উই আর স্টার স্টাফ' সেইদিন হয়তো সেই মানুষগুলো যথাযথ সম্মান পাবেন।"

দুজনেই এরপর আবার হাঁটা শুরু করলো। শঙ্খ লক্ষ্য করলো কুশল আংটিগুলো খুলে নিজের পকেটে রাখলো। শঙ্খের দিকে তাকিয়ে বললো "চেষ্টা করবো এগুলো যাতে আর না পরতে হয়"

শঙ্খ শুনতে পেল কুশল মাঝে মাঝেই বিড়বিড় করে বলছে "উই আর স্টার স্টাফ।"

সত্য কখনও অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর বদলায় না- জিওনার্দো ব্রুনো

সমাজ বিজ্ঞান ও তার বিভ্রাট

-শ্রীকুমার মন্ডল

রিহানা- আমরা কেন ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন নিয়ে কথা বলছি না ?

দেশভক্ত- বাইরের লোকজন দর্শক হতে পারে কিন্তু অংশগ্রহণকারী নয়। একমাত্র ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষকে চেনে এবং তারাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। #IndiaTogether

A- ঠাকুর ঘরে কে রে?

B- আমি তো কলা খাইনি রে।

এক মহিলার ভারতের তামাম মেরুদন্ডহীন সেলেব, যারা এতদিন লুকিয়ে ছিল, তাদের প্রকৃত মুখোশ খুলে দিল। সমস্ত দেশপ্রেমিকরা, যারা এতদিনের আন্দোলন, কৃষক মৃত্যু, ফ্যাসিজম এর অত্যাচার দেখেও চুপ করে ছিল, আজ তাদের ন্যাকা দেশপ্রেমানুভূতির পেছনে আগুন লাগিয়ে দিলো।

তার নাম রিহানা। কেন কি এমন করল এই মহিলা? এত চাপানউতরণ চলছে কেন রিহানার টুইট ঘিরে? রিহানা কি টুইট করল, নাকি কীটনাশক ছিটিয়ে দিলো যে, পোকা মাকড় গুলো কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে?

কি এমন হলো যে আজকে হঠাৎ এত এত ভারতীয় দেশ ভক্ত সেলিব্রিটি আর এন্টারটেইনারদের দেশভক্তি উগরে উগরে বেরিয়ে আসছে? সবাই এত হ্যাজট্যাগ ইন্ডিয়া টুগেদার এগেইনস্ট প্রোপাগান্ডা নিয়ে পড়ল কেন, দেশ কি ভেঙে যাচ্ছে?

আসলে কারা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, এবং কাদের বিরুদ্ধে? আসুন আসল ব্যাপারটা যে কি, সেটা বুঝে নেই, তারপর এর পেছনে সাইন্সটাকে বুঝবো।

তা এটাকে বুঝতে গেলে আগে একটা হাইপোথেটিক্যাল পরিস্থিতি বর্ননা করি। ধরুন একটা দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ বা ডিভোর্স খুব বেশি হয়। এর কারন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের অভাব। তাই সরকার তখন দায়িত্ব নিল যে ছোট বয়েস থেকে ওই দেশের শিশু দের প্রেম শেখানো হবে। তার জন্য নেওয়া হল এক অভিনব পদক্ষেপ। এক টেডি পুতুল দিয়ে, শিশুদেরকে ওই পুতুলের কেয়ার নেওয়ার টাস্ক দেওয়া হয়, এবং সেই টাস্ক কমপ্লিট করলে বছরের শেষে মার্ক্সসিট পাওয়া হয়।

টাস্ক গুলো খানিকটা এরকম, ওই টেডি কে খাওয়ানো, স্নান করানো, কাপড় পরানো ইত্যাদি ফটো তুলে ভিডিও করে, ইনস্টিটিউশন এর কাছে সাবমিট করতে হবে। আর ইনস্টিটিউশন সেই কেয়ার করার ফটো আর ভিডিও গুলো দেখে জাজ করবে আর নম্বর দেবে। সঙ্গে বড় বড় সেলিব্রিটিদের দিয়ে টেডি প্রেমের গান আর সিনেমা বছরে অন্তত একটা করে বেরোবে। টেডি দেখলে স্যালুট ঠুকতে হবে। টেডি প্রেমের গান চললে উঠে দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা এই পদ্ধতি চলতে থাকলো, টেডিপ্রেমের ট্রেনিং, সেইসব শিশুরা একদিন বড় হল, একদম ট্রেইন্ড এন্ড প্রফেশনাল প্রেমিক, প্রেমিকা সবাই। চলতে চলতে দেখা গেল বড় হয়ে ওরা প্রেম বলতে টেডি কে কেয়ার করা বুঝলো, মানুষকে ভালোবসতে ভুলে গেল। কিন্তু এতে রাষ্ট্রের শাসক দের বেশ সুবিধা হলো, ওরা নাগরিকদের এক একটা টেডি ধরিয়ে দিয়ে নিজেরা দুর্নীতি করতে পারে, নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে পারে, এদিকে ট্রেইন্ড টেডি প্রেমী নাগরিকরা টেডি কেয়ার করতে ব্যস্ত। রাষ্ট্রের অবস্থা, সমাজ-অর্থনীতি এমনকি মানুষকে পর্যন্ত ভুলে গেছে ট্রেইন্ড প্রফেশনাল প্রেমিকরা। ওরা দেশ বলতে বোঝে টেডি, দেশ প্রেম বলতে বোঝে টেডি প্রেম।

কি, কিছু রিলেট করতে পারছেন? হ্যাঁ, আমাদের ছোটো থেকে দেশপ্রেমের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। অনেকটা এই ভাবে যে জাতীয় সঙ্গীত চললে সবাইকে উঠে দাঁড়াতে হবে। পতাকা দেখলে স্যালুট জানাতে হবে, না জানলেই দেশদ্রোহী। সেনা, আধা সেনা আর পুলিশ, যারা রাষ্ট্রের ভাড়া করা মারনযন্ত্র তাদের দেখলেই সম্মান জানাতে হবে। দেশের পপুলার সেলিব্রিটি আর এন্টারটেইনারদের কাছে দেশপ্রেম শিখতে হবে। তাদেরকে আইডল বানাতে হবে, তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করতে হবে। ওরা যা বলবে সেটাকেই ধ্রুব সত্য বলে মনে করতে হবে, সেটা না হলেই দেশদ্রোহী বা বামপন্থী বলে দাগানো হবে। বছরে অন্তত একটা করে হলেও দেশপ্রেম মূলক গান আর সিনেমা বানিয়ে দেশপ্রেমের ট্রেনিং দেওয়া বেসরকারি আর্টিস্ট দের জন্যও বাধ্যতা মূলক। এবং আমরা এটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করেছি, কারণ আমাদের ছোটো বেলা থেকে সেই ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। আমরা সেই ট্রেইন্ড প্রেমিক, যারা দেশপ্রেম বলতে বোঝে পতাকা প্রেম, জাতীয় সঙ্গীত প্রেম, দেশীয় সেলিব্রিটি প্রেম, দেশের সমাজ,

অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এমনকি আমরা মানুষকেও ভুলে গেছি। যেখানে দেশ বলতে কোনো ম্যাপ নয়, দেশ বলতে বোঝায় সেই দেশের মানুষ, সেই দেশের কৃষক আর মজুর। অথচ তারা না খেতে পেয়ে বা শিক্ষার অভাবে মারা গেলেও চলবে কিন্তু পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, সেনা আর মেরুদন্ডহীন সেলিব্রিটিদের গুরু মনে করে অন্ধ অনুসরণ করে আমাদের দেশপ্রেমের প্রমান দিয়ে যেতে হবে প্রতি সেকেন্ডে। তাই এতে সুবিধা হয় কিছু স্বার্থান্বেষী শাসকদের। তারা অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা আর সংস্কৃতি কে ধর্ষণ করে চললেও আমরা দেখতে পাই না। এছাড়াও তাদের পদ লেহনকারি স্বার্থকেন্দ্রিক সেলিব্রিটিরা ওদেরই মালিকের বলে দেওয়া বুলি আওড়াবে, কারণ ওদের পেট চলে মালিকের পদ লেহন করেই।

কি ভাবছেন? প্রেম এক পবিত্র জিনিস যাকে এক মুক্তাঙ্গন বলে ভাবতেন? প্রেম এক স্বয়ংক্রিয় অনুভূতি যাকে ট্রেনিং দিয়ে শিখিয়ে ট্রেইন্ড দেশপ্রেমিক রোবট তৈরি করা সম্ভব নয় বলে মনে করতেন? প্রেম কোনো মেকানিক্যাল জিনিস নয় এক মানবিক অনুভূতি, যা রোবট দের দ্বারা সম্ভব নয় বলে ভাবতেন? আপনাদের কে বলে এইসব ফালতু কথা? নিজের চোখের সামনে তো দেখছেন মিলিয়ন মিলিয়ন ট্রেইন্ড দেশপ্রেমিক রোবট কে, যাদের কৃষক আন্দোলন আর কৃষক মৃত্যুতে কিছু যায় আসে না, যদিও তারাই হল প্রকৃত দেশ। কোনো পতাকা, কোনো জাতীয় সঙ্গীত, আম্বানি, আদানি, শাসক বা তাদের পদ লেহনকরি সেলিব্রিটি, ক্রিকেটাররা আসলে দেশের কিছুই নয়। অথচ তাদের পদ চুম্বন করে নিজেদের দেশ প্রেমের প্রমান দিতে তারা সদাব্যস্ত।

'মেরে ওয়াতান কে লোগো, যারা আঁখ মে ভারলো পানি'
'মেরে দেশ কি ধারতি সোনা উগলে, উগলে হিরে মোতি'
'মেরা দেশ, মেরা মূলক, মেরা এ ওয়াতান'
'দিল দিয়া হ্যা, যান ভি দেঙ্গে, এ ওয়াতন তেরে লিয়ে'
'তেরি মিট্টি মে মিল যাওয়া, গুল বানকে ম্যা খিল যাওয়া'
কি মেরে পিয়ারে দেশ বাসিওঁ!?

দেশপ্রেম দেশপ্রেম ফিল আসছে কি না? হ্যাঁ ঠিক এই ভাবে দেশপ্রেমের ট্রেনিং পেয়েছি আমরা। কটা গান আর সেলিব্রিটির নাটক দেখিয়ে, জোর করে কৃত্তিম ট্রেইন্ড প্রেমিক বানানো হয়েছে আমাদের। আমরা তাই দেশ প্রেম বলতে এগুলোকেই বুঝি। দেখলেন তো ট্রেনিং দিয়েও কৃত্তিম প্রেমিক বানানো যায়, যার কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, একদম মেকানিক প্রেমিক। ইনফ্যাক্ট আপনি নিজেও তাই। আচ্ছা ভাবুন তো, পতাকা উল্টো টাঙানো হলে আপনার কষ্ট হয় কি হয় না?

খুব কষ্ট হয় নিশ্চই? একেই বলে দেশপ্রেম, একদম টুরু লাভ।

কিন্তু দেশ যে ক্ষুধার ইনডেক্সে সবচেয়ে উপরের দিকে, দেশে কত মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়, তাতে কি আপনার সেই লেভেলের কষ্ট বোধ হয়?

আচ্ছা ভাবুন, দেশের এক মহান ক্রিকেটার অমুক চন্দ্রকে যখন কেউ সমালোচনা করে তখন কি ধরনের কষ্ট অনুভব করেন?

আর বেকারত্বের জ্বালায় যুবকেরা আত্মহত্যা করলে, তখনও কি একই কষ্ট হয়?

আচ্ছা রিপাবলিক ডে, স্বাধীনতা দিবস এইসব ইভেন্টে আমাদের দেশের গৌরবান্বিত সব মুহূর্ত তুলে ধরা হয়, কিন্তু গড়ে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, ক্ষুধা, বেকারত্ব, ফুটপাতে শুয়ে থাকা গরিব দের তুলে ধরা হয় না কেন? মানে এগুলোও তো এই দেশেই ঘটে, না কি শুধু গৌরবান্বিত যা কিছু আছে সব এই দেশে ঘটে আর যত লজ্জাঙ্কর জিনিস অর্থাৎ খুন, ধর্ষণ, অপরাধ, দুর্নীতি ওসব এদেশে ঘটে না, ভিন্ন কোনো দেশে ঘটে?

ওই ভাবে তুলে ধরার কারণও হল এগুলো ওই দেশ প্রেম এর ট্রেনিং কোর্স এর মধ্যে পড়ে। যা ভালো কিছু আছে সেগুলো দেখানো হোক, খারাপ চাপিয়ে দেয়া হোক, এতে বায়াসড আবেগ নিয়ে উলঙ্গ রাজার দেশের অন্ধ অনুসারী ভেড়ার পালের মত নাগরিক হয়ে উঠবে ট্রেইন্ড মেকানিক্যাল মস্তিস্ক হীন দেশপ্রেমিক বোট।

একদম প্রিপ্ল্যানড ভেড়া পোষণ এর রাষ্ট্রীয় শোষণ পলিসি।

এই ভাবে বড় হওয়ার কারণ শুধু এই কয়েক বছরের মধ্যে নিহিত নেই। বহু বছর আগের থেকেই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি নামক এক অলীক বস্তু গেলানো হয়, আর তার ফল আজকে বেরচ্ছে।

কি আছে এই সংস্কৃতিতে? আসুন আমরা একটু খুলে দেখার চেষ্টা করি।

এই ভারতীয় সংস্কৃতি নামক মেকি সংস্কৃতি আসলে কিছুই নয়, ভক্তিবাদ ও অন্ধ অনুসরণ ছাড়া। আচ্ছা ভক্তিবাদ কি জিনিস? আমরা সবাই নিশ্চই ছোটো বয়েস থেকে জেনে আসছি গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখতে হবে। গুরুজনের সঙ্গে বিতর্ক করা শোভনীয় নয়। বড় বড় মনীষীদের গলায় মালা দিয়ে শ্রদ্ধা করতে হবে, কিন্তু তাদের কোনো কোয়েশ্চেন করা যাবে না। বড়রা কথা বললে তার মাঝে কথা বলা যাবে না (তা সে তুমি তাদের থেকে যতই ঠিক বল না কেন) কোনো এক বা একাধিক সেলিব্রিটিকে ধরে তার বা তাদের পা চাঁটতে হবে। শিক্ষক দেখা মাত্র মাথা নত করে পায়ে হাত দিয়ে ভক্তি জহির করতে হবে। নেতা, মন্ত্রী হলে তো কথাই নেই। বড়রা ছোটদের তুই বলে সম্মোধন করতে পারে কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রে বড়দের কে সবসময় আপনি বলে সম্মোধন করতে হবে। তা এই সমস্ত নীতিশিক্ষার মূল হল আসলে কোনো প্রশ্ন না করে অন্ধ অনুসরণ করতে হবে। মেরুদন্ড ফেলে দিয়ে তেল দিতে হবে। হ্যাঁ এটাই হল ভক্তিবাদ, এটাই হল সেই মেকি ভারতীয় সংস্কৃতি যা আমাদের গেলানো হয়। এরকম শিক্ষা পেলে কোনো শিশু বড় হয়ে মেরুদন্ড হীন ভেড়ার পাল ছাড়া ভিন্ন কিছু হবে বলে মনে হয়?

ব্যাপারটা কে আরো ভালো করে বুঝতে গেলে আসুন আমরা ওই তথাকথিত ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে কোনো এক ভিন্ন অভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে দেখি। কোনো এক অভারতীয় সংস্কৃতিতে 10 বছরের এক ছোট্ট শিশুকেও এক পারসন বা ব্যক্তি বলে বিবেচনা করা হয়, তার মতামত কে গুরুত্ব দেওয়া হয়, প্রশ্ন করার অধিকার দেওয়া হয়, ঠিক এক 55 বছর বয়স্ক পরিণত ব্যক্তির মতো। এতে ওই শিশুটি খুব ছোটো বয়েস থেকেই নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের মতামত, নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়।

এখানে তুই, তুমি, আপনি বলে কিছু নেই, এখানে ছোটো থেকে বড় সবাইকে you বলে সম্মোধন করা হয়, অর্থাৎ সবাই সমান। এখানে ছোটদের "ওয় পাঁচু, এখানে কি করছিস, মারবো দেখবি" টাইপের সম্মোধন করা হয় না। এখানে বলা হয় "মিস্টার পাঁচু গোপাল ইউ আর রিকুয়েস্টেড টু স্টেপ এসাইড"। ঠিক যেমন 55 বছর বয়স্ক পড়ার সম্ভ্রান্ত রবি কাকুকে বলা হয়।

তাহলে এই সংস্কৃতির শিশু, যে সাম্য দেখে বড় হচ্ছে সে সাম্যতা শিখবে না ওই ভারতীয় সংস্কৃতির শিশু যে জন্ম থেকে ডিসক্রিমিনেসন আর হেট্রেট দেখে বড় হয়েছে সে সাম্য বাদি হবে?

ভালো খারাপ কে বুঝবে, প্রশ্ন করতে কে শিখবে?

যে ছোটোবেলা থেকে মতামত রাখার সুযোগ পেয়েছে এবং তাতে অভ্যস্ত হয়েছে না কি যার মতামত ছোটো বেলা থেকে পরিবার তন্ত্র আর রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা দাবিয়ে রাখতে শেখানো হয়েছে?

চলুন এবারে আসাযাক মূল প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গটা ছিল #Indiatogether এর প্রয়োজন পড়ল কেন? দেশটা কি ভাগ হয়ে যাচ্ছে? কোন বিদেশি শক্তির কথা বলা হচ্ছে কেন বলা হচ্ছে? বিদেশি শক্তি হঠাৎ এদেশকে ভাগ করতে এলো কেন? আদৌ কি বিদেশি শক্তি এলো নাকি সর্ষের মধ্যে ইয়ে মানে দেশের মধ্যেই দালাল ইয়ে মানে ভূত আছে?

তার জন্য দেখে নেই সমাজ বিজ্ঞান কি বলে। আমরা সমাজ বিজ্ঞানে তিনটা শ্রেণীর মানুষের কথা জানবো।

১. কনজারভেটিভ; এরা হচ্ছে শাসক ও ক্ষমতা লোভী শ্রেণী। এরা সবসময় কনজারভেটিভ এরা সমাজের মৌলিক পরিবর্তন চায় না, কারণ সমাজে মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন এলেই ওদের হাত থেকে ক্ষমতার রাস ছেড়ে চলে যাওয়ার ভয় আছে।

২. লিবেরাল; এই শ্রেণিটার কথা ভালো করে পড়বেন, কারণ যত গন্ডগোলের মূল এরাই। এরা হচ্ছে এলিট গ্রুপ যারা শাসকের প্রিয় স্থানীয় শ্রেণী। শাসক ও ক্ষমতার পা চেঁটে নিজেদের যে টুকু সুবিধে করে নিয়ে পেট চালানো যায়, এরা তাতেই সন্তুষ্ট। সাধারণত বড় বড় সেলিব্রিটি থেকে শুরুকরে উচ্চমধ্যবিত্ত এই দালাল শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

৩. র‍্যাডিক্যাল; নাম শুনেই বুঝতে পারছেন এরাই আসলে সমাজের মুলগত বা ভিত্তিগত পরিবর্তন চায়। আসলে এরাই হল প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা লোভী আর ক্ষমতার পা চাঁটা দের শোষনের শিকার। এবং এই ভুক্তভোগীদের সংখ্যা তিনটে শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এরা হল আসলে মজুর আর কৃষক শ্রেণী। এরা বিদ্রোহ চায়, আন্দোলন চায়, বিপ্লব চায়, নবজাগরণ চায় কারণ এরা শোষিত, নিপীড়িত। সংখ্যায় বেশি হয়েও খুব কম সম্পদের অধিকারী আর বেশিরভাগ সম্পত্তি ওই ওপরের দুটি শ্রেণীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে ওদের পকেটে যায়।

দেশ বলতে বোঝায় আসলে র‍্যাডিক্যাল শ্রেণীর লোকেদেরকে, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম শোষিত হয়ে দেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু দিনের শেষে ওরাই বঞ্চিত থাকে।

ওদের বঞ্চনা, ওদের কষ্ট যখন শাসক তথা শোষক শ্রেণী দেখেও না দেখার ভান করে তখন এরা গড়ে তোলে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ। ঠিক যেমন আজকের এই কৃষক বিদ্রোহ চলছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার সবার আছে, তা সে আমেরিকান হোক কিংবা আফ্রিকান, এদেশীয় হোক কিংবা মঙ্গল গ্রহের। হিউম্যান রাইট বা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে যারা প্রতিবাদ করে তারাই মানুষ, আসলে তাদের মধ্যেই মনুষ্যত্ব আছে। তাই সেই মনুষত্বের কারণেই রিহানা, এমান্ডা, গ্রেটারা টুইট করেছিল, কোনো দেশ কে ভাঙতে নয়। তাহলে দেশ ভাঙার গল্প এলো কেন? প্রোপাগান্ডা আসলে কে ছড়াচ্ছে?
সেই অসহায় শোষিত কৃষক দের আন্দোলন আর মৃত্যুর পরেও যে সব মেরুদন্ড হীন, মনুষত্ব হীন মানুষ রূপী জীব গুলো সেই অসহায় কৃষকদেরই ফলানো ফসল খেয়ে মনের আনন্দে হেগে যাচ্ছিল। টুঁ শব্দটি বের করেনি। আজ সেই সব সেলিব্রিটিরা নাকি আমাদের শেখাবে দেশ সম্পর্কে, তারাই বলে দেবে দেশকে কিভাবে একত্রিত হতে হবে(#IndiaTogether)। তাদের নিজেদের তো মনুষত্ব নেই, কিন্তু যাদের মনুষত্ব আছে, অর্থাৎ যারা এই বিষয়ে মতামত জানাচ্ছে, মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলছে, তাদের বিরুদ্ধেই এরা হাত পা ধুয়ে নানান অপ্রাসঙ্গিক ও ভ্রান্ত অপবাদ দিয়ে ভুল প্রমান করার চেষ্টা করছে।
এবার বলুন তো এরা কোন শ্রেণীর?

হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, এরা হল সেই মেরুদন্ড হীন পা চাঁটা শ্রেণী, অর্থাৎ লিবেরাল। এরা সেই সমস্ত বড় বড় সেলিব্রিটি, যারা ক্ষমতার পা চেঁটে নিজেদের পেট চালায়, নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে। এরা নিজেদের ফেম কে ক্যাপিটেলাইজ করে ওই প্রভুদের কাছে কোটি কোটি কামায় আর ফেম ধরে রাখার জন্য সমস্ত শ্রেণীর গায়ে হাত বুলিয়ে যায়। এরা নির্লজ্জ, এরা জাতির উন্নয়নে ভূমিকা তো রাখেই না, বরং জাতির ক্ষতি করে। এরা মানব সভ্যতার কলঙ্ক, এরা মানব জাতির জন্য যন্ত্রণাময় দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা। এর পরে বাকি কাজ তো আমাদের আছেই। আমরা ভক্ত সংস্কৃতিতে বড় হওয়ার কারণে আমাদেরও কোনো একটা idol চাই পুজো করার জন্য, সেই সুযোগ নিয়ে ওরা নিজেদের পা বাড়িয়ে দেয় আমাদের দ্বারা পূজিত হওয়ার জন্য। আর এই ভাবেই তারা খুব সহজেই ফেম পেয়েযায়, যেটাকে ওরা ক্যাপিটেলাইজ করে ওই ক্ষমতার প্রভুদের পা চেঁটে চেঁটে কোটি কোটি কামায়। এছাড়াও আমরা বরাবর ওই ট্রেইন্ড দেশপ্রেমিক মেশিন। নিজেদের দেশ প্রেম প্রমান করার জন্য সদা ব্যস্ত। তাই আমরা তো ওই সেলিব্রিটির কাছ থেকেই দেশ প্রেম শিখবো, বাকি যে যা বলে বলে যাক, আমি তো পতাকা উত্তোলন করে আর সেলিব্রিটিদের পুজো করে দেশপ্রেম দেখিয়ে যাবো।

নারী শক্তি

-মহম্মদ মহসীন

ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখলাম। ট্রেনে এক দম্পতি চলেছেন। সামান্য মতান্তরে স্বামী চড় মারলেন স্ত্রীকে। প্রকাশ্যে। কোনোপ্রকার ইতস্তত না করে। যেন এ অত্যন্ত এক স্বাভাবিক ঘটনা। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না এই প্রহার তার অভ্যাসবশত। সহযাত্রীরাও নির্বিকার। তারাও এটিকে স্বাভাবিক হিসাবেই নিয়েছেন। কোনো প্রতিবাদ নেই। নীরবে মার খাচ্ছেন এক নারী। এই নির্যাতন সমাজের গালে সপাটে এক চড়। অমানবিকতার ভিতে গড়া এই সমাজে বোধহয় এটি বিশেষ অকাম্য নয়। ধর্ম তাদের এই জীবন বিধান দিয়েছে। এতে তারা লজ্জা পায় না, গর্ব অনুভব করে।[১] তাই আমরা নিয়োজিত হয়েছি এই সমাজের ধর্ম ভিতকে উৎপাটিত করে যুক্তি নির্ভর বাস্তব ভিত গড়ে নতুন সমাজ রচনার কাজে। স্ত্রীকে প্রহার। ধর্ম অনুমোদিত জীবন বিধান। নির্লজ্জ সগর্ব প্রকাশ্য ব্যবহার।

কোরাণে এই প্রহার বিষয়ে যা মত দিয়েছে তা নিয়ে কেউ জানতে চাইলে নিম্নের লিংকে যেতে পারেন।[২] এখন ঘটনা হচ্ছে পুরুষ ধর্ম ধর্মগ্রন্থ রচনার মাধ্যমে নারীর উপর প্রভুত্ব খাটানোর প্রচেষ্টা করেই চললেও, ব্যতিক্রমী কিছু নারী আছেন, তারা পুরুষের এই নিয়ম মানেন না। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেন। নিচের লিংকে দেখবেন স্ত্রী তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রতিবাদে বাসেই স্বামীকে প্রহার করছে।[৩]

দুটি ছেলেমেয়ে বন্ধুরূপে মিশছে। কিন্তু সীমারেখা অতিক্রম, যেখানে বলপ্রয়োগের ঘটনাও দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে নারী আত্মসম্মানী, প্রতিবাদী। আমার বাড়ির কাছে রেল স্টেশনে বিকালে হাঁটতে যাই। একদিনের ঘটনা। দুটি ছেলে মেয়ে। কাছেই এক পলিটেকনিক কলেজ আছে। সেখানে কিছু খোঁজখবর নিতে এসেছিল। সেই সুত্রে দুজনের আলাপ পরিচয়। যাবেও একই ট্রেনে। প্লাটফর্মে বসেছিল। প্লাটফর্মে আলো খুবই অল্প। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্লাটফর্ম ফাঁকাই ছিল। হঠাৎ দেখি মেয়েটি ছেলেটিকে মারছে। দ্রুত গেলাম তাদের কাছে কয়েকজন। জানা গেল, পরিচয়ের সুবাদে ছেলেটি কিছু খারাপ আচরণ করেছে। মেয়েটি তা হজম করে নেয় নি। তার পারিবারিক শিক্ষা, এসব ক্ষেত্রে কখনই আপোশ নয়, এভাবেই জবাব দিতে হয়। মেয়েটির স্বাভিমানকে সকলেই স্যালুট জানালো। একেই বলে নারীশক্তির জাগৃতি। অনেক পরিবারেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়।

অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে কথা বলার শিক্ষা যে পরিবার দেয়, সমাজ গঠনে সেই পরিবার জমি প্রস্তুতির কাজটি করে দেয়। অন্যায়কে মেনে নেওয়ার শিক্ষা কখনই সুশিক্ষা হতে পারে না। দেশ গঠনে নারি শক্তির ক্ষমতা যে কী অপরিসীম তা আজ দিল্লী সীমান্তে কৃষিবিরোধী পঞ্জাবের মেয়েরা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। সমাজে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠায়, প্রসারে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি অর্থবহ। আংটি মাদুলির সগর্ব প্রকাশে অশিক্ষা কুশিক্ষায় ছেয়ে যাওয়া সমাজে বস্তুবাদী চিন্তনের বড় প্রয়োজন।

পুরুষতন্ত্র কায়েম করার জন্য দরকার হয় ধর্মের। নারীকে পুরুষের অঙ্গুলিহেলনে চালাতে সকল ধর্মের নানান নিয়ম কানুন। পাখী যেমন খাঁচায় থাকতে থাকতে উড়তে ভুলে যায়, সমাজে পোষমানা নারীও তাই ভুলে গেছে তার মাঝের শক্তিকে। সে দেখেই নি নারী শক্তি। তাই কোনো নারী যখন এই জেগে উঠে এই পুরুতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন পুরুষতন্ত্রের ধারক- পুরুষের সাথে বহু বহু নারীও সোচ্চার হয় তার কণ্ঠ থামিয়ে দিতে। পুরুষতন্ত্র বিরোধী পুরুষদেরও ব্যাঙ্গ বিদ্রূপের শিকার হতে হয়।

ইসলামে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তাদের পুনরায় ঘর সংসার করতে হলে স্ত্রীকে অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করে ঘর করতে হয়, নতুন স্বামী তালাক দেয়, তারপর সে নিজ স্বামীর কাছে যেতে পারে। এই বিয়েকে বলা হয় হিল্লা বিবাহ।[৪]
নীচের লিংকে নারী বিষয়ক ৩. ০ এর মধ্যে ৩.১ নারী অবমাননা হিল্লা বিবাহ অংশ দেখতে পারেন।[৫]

মুর্শিদাবাদের আসমা বিবি এক খেটে খাওয়া নারী। তার স্বামী তিন তালাক দিলে, মোল্লারা তাকে হিল্লা বা মুতা বিবাহের ফতোয়া দিলে সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলে, আমার কি মান সম্মান নেই? পর পুরুষের সাথে আমি থাকবো না। কোরাণ হাদিসের এসব আইন আমি মানি না। মোল্লাদের সাথে মুসলিম মেয়েরাও তার বিরুদ্ধে যায়। প্রত্যাশিত ছিল অন্তত 'শিক্ষিত' মেয়েরা তাকে সমর্থন করে তার পাশে দাঁড়াবে। আসমা জানতো না তসলিমাকে বিতাড়িত করেছে বাঙলাদেশের মোল্লারা, বাঙলাদেশের সরকার, তসলিমাকে রাতের আঁধারে কলকাতা থেকে দিল্লীর ঘাড়ে ফেলে দিয়েছিল সি পি এম সরকার। প্রত্যাশা করেছিলাম মোল্লাদের থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেবে বামফ্রন্ট সরকার।

পুরুষতন্ত্র কিভাবে তার শিকড় বিস্তার করেছে রাজনীতির সাম্রাজ্যে। রাজনীতি সেই আন্দোলনে সমর্থন দেবে না, যদি হও একলা। তাই আসমাকে সহ্য করতে হয় সমাজের নির্যাতন। তবু ভাঙে না। একেই বলে নারী শক্তি।

লিংকগুলি-

১) https://youtu.be/Jh6Q5LeAoTA

২) https://www.google.co.in/amp/s/www.shongshoy.com/archives/13370

৩) https://youtu.be/rJNCCoRLLpU

৪) https://www.google.co.in/amp/s/www.shongshoy.com/references/islam

৫) https://www.google.co.in/amp/s/www.shongshoy.com/references/islam (হিল্লা বিবাহ)

প্রেমের সাতকাহন!

- রাজা দেবরায়

১৪ই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে মানে প্রেম দিবস! এই দিনটি স্পেশাল হলেও ৭ ফেব্রুয়ারি থেকেই বিভিন্ন 'ডে' বা দিবস পালন করা হয়। ৭ই ফেব্রুয়ারি রোজ ডে থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি-ভ্যালেন্টাইন্স ডে অবধি

প্রথমে সাদা মনে কিছু কথা বলে নিই। কিছু 'অবান্তর' প্রশ্ন সরল মনে বা মাথায় ঘোরাফেরা করছে। যেমন-

১) ৭ই ফেব্রুয়ারি রোজ ডে'তে কি শুধুই লাল গোলাপ দিতে হবে নাকি অন্য রংয়ের গোলাপও দেওয়া যাবে?

২) ৭ই ফেব্রুয়ারি গোলাপ দিবস হওয়ায় ৮ই ফেব্রুয়ারি প্রোপোজ ডে'তে কি আবারো গোলাপ দিয়েই প্রোপোজ করা যাবে? যদি যায় তবে গোলাপ দিবসের তাৎপর্য কী থাকবে?

৩) ঠিক তেমনি ৯ই ফেব্রুয়ারি চকলেট ডে এবং ১০ই ফেব্রুয়ারি টেডি ডে হওয়ায় ৮ই ফেব্রুয়ারি প্রোপোজ ডে'তে ঐগুলো দিয়েই কি প্রোপোজ করা যাবে? যদি যায় তবে চকলেট দিবস আর টেডি দিবসের গুরুত্ব কি আদৌ থাকবে?

৪) ১১ই, ১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে প্রমিস ডে, কিস ডে এবং হাগ ডে হওয়ায় ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাহলে কী বাকি থাকবে? বিয়ে?

৫) তাছাড়া যেকোনো সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 'বন্ধুত্ব'। তাই ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে বা ৭ই ফেব্রুয়ারির আগে 'বন্ধুত্ব দিবস' থাকলে কি ভালো হতো না?

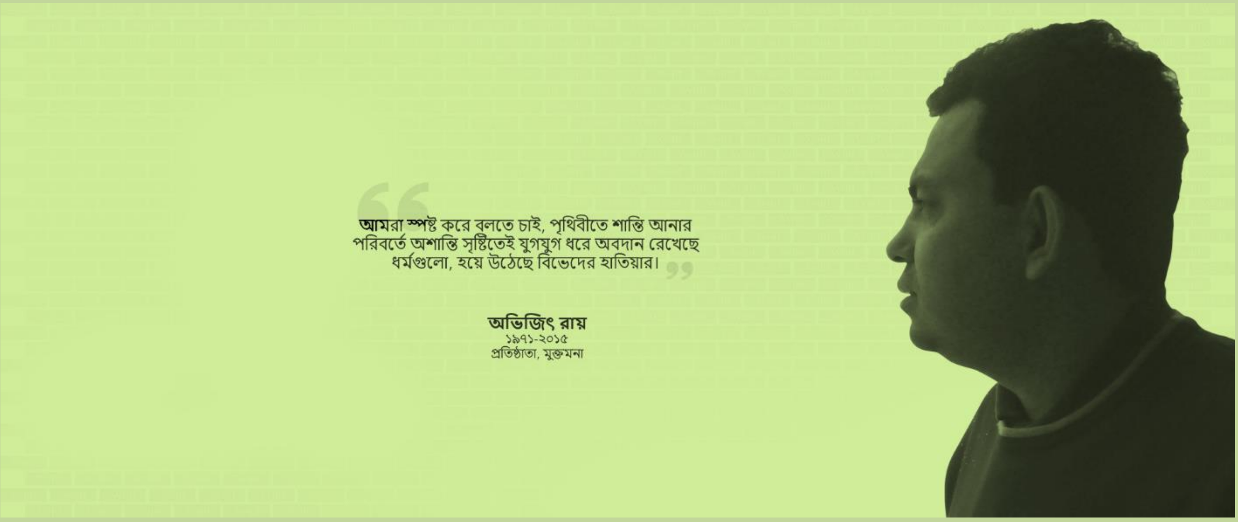
এবার একটু বহুচর্চিত তাত্ত্বিক কথা বলি। প্রেম দিবস কি শুধুই নির্দিষ্ট একদিন বা নির্দিষ্ট কয়েকদিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বা থাকে? জানি, আমরা প্রায় সবাই এর উত্তরে 'না' বলবো। তবে ভালোভাবে উদযাপন করার জন্য নির্দিষ্ট একটা দিনকে বা নির্দিষ্ট কয়েকদিনকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাই না? কিন্তু দুঃখের কথা হলো আমাদের সমাজে বর্তমান সময়েও প্রেম বিষয়টিকে সহজভাবে নেওয়া হয় না। রবি ঠাকুর, কাজী নজরুলের প্রেমের গান শুনলেও বা গাইলেও প্রায় বলা যায় অধিকাংশই প্রেম করতে দেখলে বা প্রেম করছে জানতে পারলে স্বাভাবিকভাবে একে স্বাগত জানানোর মানসিকতার অধিকারী হয়ে ওঠেন না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, পাড়ায় প্রেম করতে দেখলে একজন আরেকজনকে বলেন "কি আরম্ভ করেছে দেখেছেন, পাড়ায় তো থাকাই যাবে না দেখছি। বিশ্রী ব্যাপার চলছে।" ভাবুন প্রেম করছে অন্যরা, পাড়ায় থাকতে পারছেন না উনি। অনেক সময় মনে হয় এটা কি ঈর্ষায়

বলেন? নিজে করতে পারলে সব ঠিক হতো তখন? আসলে আমাদের সমাজে এখনো প্রেম উদযাপন করার কোনো উদ্যোগ বা সুযোগ নেই!

তবে বড় বড় মানুষেরাই তো বলেন "প্রেম বড় পবিত্র ব্যাপার" এই সেই! আসলে এগুলো মুখেই বলা হয় শুধু। আমাদের সিস্টেমে একটা লোক ঘুষ খেলে যতটা না সমালোচনা করা হয়, প্রেম করলে তার থেকে অনেক বেশি করা হয়। এককথায় বলে দেওয়া হয় "লোকটার চরিত্রের ঠিক নেই।" চরিত্রের বাস কোথায় তাহলে? পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গলিতে বা গোপন জায়গায় প্রেম করতে হয় কেনো ছেলেমেয়েদের? প্রেম যদি সত্যিই পবিত্র হয়ে থাকে তবে লুকিয়ে লুকিয়ে কেনো প্রেম করতে হয়? কারণ, প্রেম মানে 'পাপ' বা 'অপরাধ'? প্রেম করলেই 'দোষী'? কিন্তু মজার বিষয় হলো এত অপবাদ সত্ত্বেও প্রেম চিরকালীনই অমর ছিল, আছে এবং থাকবে!

নিজেরা প্রেম করে বিয়ে করেছেন, এমনকি হয়তো পালিয়েও বিয়ে করেছেন, কিন্তু তারপরেও দেখা যায় বা যাবে প্রেমের ব্যাপারে অ্যালার্জি! তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে কিছুটা সতর্কতামূলক ব্যাপার অবশ্যই থাকা উচিত। তার জন্য হয়তো সন্তানদেরকে সম্মানিত অভিভাবকদের বলা উচিত, প্রেম করলে বাড়িতেই সবার সামনে করা ভালো! তাতে অন্তত কিছুটা হলেও অহেতুক ভয় কাটবে এবং সতর্কতাও বজায় থাকবে! তবে প্রেম করাকে অপরাধের সামিল করাটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সবথেকে বড় কথা, প্রেম তো বলে কয়ে বা ডেকে আসে না, দিন-তারিখ দেখেও আসে না। প্রেম হয়ে যায়! কখন প্রেম আমাদের জীবনে আসবে সেটা হয়তো আমরাও বলতে পারবো না! আর প্রেম যে শুধুমাত্র একজনের সাথেই হবে বা সারাজীবন একজনের সাথেই থাকবে সেই গ্যারান্টি কে দিতে পারে?

এবার একটু বুদ্ধিদীপ্ত কথায় যাই। শুরুতে যে 'অবান্তর' প্রশ্নগুলো মাথায় এসেছিলো, সেগুলোর আসলে প্রাসঙ্গিকতা আছে। এই যে বিভিন্ন 'ডে' আজকাল আমরা দেখছি, এগুলোর পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হলো মূল কথা। আসল কথা আমাদের ইমোশন বা আবেগকে পুঁজি করে গিফ্ট কেনাতে উৎসাহী করা হয় বা অন্যভাবে ভাবলে বাধ্য করা হয়! 'গিফ্ট' হচ্ছে মুখ্য বিষয়! আবার কী গিফ্ট দিতে হবে বা কী ধরনের ফুল দিতে হবে সেটারও মোটামুটি একটা ধারণা স্থির করে দেওয়া হয়েছে। যেমন- দামী চকলেট, লাল গোলাপ, টেডি বিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, তত্ত্বকথা বা বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যালাপকে মাথায় রেখেই আসুন আমরা প্রেম দিবসের এই কয়েকদিন প্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে রবি ঠাকুরের গান গাই- “আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।”



একুশ শতকের লজ্জা: ডাইনি

-অভিষেক দে

সময়টা ২০০১ সালের সম্ভবত জানুয়ারি মাস। বাঁকুড়ার একটি গ্রামে গিয়েছি বন্ধু কৌশিক এর মামাতো দাদার বিয়েতে। বিয়ের আগের দিন সন্ধেবেলা গ্রামে পৌছে মেতে গেছি বিয়ের অনুষ্ঠানে। পরের দিন খুব ভোরে উঠে বন্ধুর একজন মামার সাথে বন্ধু কৌশিক এবং আমি বেরিয়েছি শীতের সকালে গ্রাম ঘুরতে। ঘুরতে ঘুরতে এক যায়গায় দেখি অনেক মানুষের ভীড়। ব্যাপার টা কি জানতে আমরা তিনজনে উক্ত স্থানে চলে আসি। দেখি কয়েকজন হোমড়াচোমড়া ব্যাক্তি খুব উত্তেজিত হয়ে কয়েকজন কে যেন কড়াভাষায় কিছু বলছে এবং তাঁদের অনতিদূরে একজন ষাটোর্ধ মহিলা অসহায় ভাবে মাটিতে মাথা নীচু করে কাঁদছেন। বন্ধুর মামা আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে বিষয় টা জেনে এসে আমাদের জানালেন, উক্ত মহিলা নাকি ডাইনি। গ্রামের একজন কে দেখলাম উনি নাকি গুণিন, তিনিই নাকি জানিয়েছেন উক্ত মহিলাটি একজন ডাইনি এবং মহিলার পরিবার কে গ্রামের মাতব্বর দের কাছে পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে এর জন্য নইলে গ্রামে থাকা উক্ত পরিবারটির পক্ষে নাকি অসম্ভব।

ডাইনির ব্যাপারে গল্পের বইতে আগে অনেক পড়েছি, কিন্ত এভাবে সরাসরি একজন ডাইনি কে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম বিষয়টা সেদিন ভালোভাবে না জানার দরুন। জানিনা, ডাইনি ঘোষিত সেই মহিলা এবং তাঁর পরিবারটি আদৌ অতগুলো টাকা দিয়ে গ্রামে থাকতে পেরেছিলেন কিনা। অনেক পরে জেনেছি ডাইনি বা ডায়েন বলে বাস্তবে কিছুই হয় না,ওসব গল্পগাঁথাতেই সম্ভব। কিন্ত আমি বললেই বা লোকে মানবে কেন? বাড়ির চালে ফনফন করে লাউ গাছ বেড়ে উঠছিল,কড়াও পরেছিল রাশি রাশি। আচমকা গাছ শুকিয়ে মরে গেলো। কেউ কি তবে কু-নজর দিয়েছে গাছে? কে-সে? ডাইনি নয় তো? সদ্য প্রসুতির সন্তান ক্ষিদের জন্য কাঁদছে অথচ মায়ের স্তনে মুখ দিচ্ছে না, কেউ কি মায়ের স্তন ভেড়ে দিয়েছে? সে, ডাইনি নয় তো? ছটফটে শিশুটা কেমন যেন হঠাৎ করেই ঝিমিয়ে গেছে। এটা ডাইনির কু-নজর নয়তো? এই তো গতবছর হারাণ এর মা এর পায়ে ঘা হয়, মলম লাগিয়েও কাজ হয় নি শেষে গ্রামের একজন গুণিনের কাছে জানতে পারলো গ্রামেরই এক ডাইনি, সেই পা এর রোগ টা জিইয়ে রেখেছে। শেষে গুণিন কে দক্ষিণা দিয়ে কিসব শেকড়বাকড় পরে সুস্থ হলো।

শুধু আদিবাসী সমাজ নয়, শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া কিংবা শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত শহুরে মানুষের একাংশও ডাইন বা ডাইনি বা ডায়েন এ গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। আদিবাসী সমাজে এই বিশ্বাস হচ্ছে সমুদ্র গভীর। কোনো গ্রামের কোনো গুনিন,জানগুরু, ওঝা,দিখলি, সৎসখা ইত্যাদিরা যদি কোনো মহিলাকে একবার ডাইনি ঘোষণা করে দেয় তাহলে সেই মহিলাকে বাঁচানো খুবই সমস্যার। গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বর দের বিধান মতো ঘোষিত ডাইনির পরিবার কে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিয়ে তবে গ্রামে থাকতে হয়। কখনওবা ডাইনি বলে যাকে দেগে দেওয়া হয় তাঁকে প্রকাশ্যে নির্মম ভাবে হত্যাও হয়। খবরের কাগজে প্রায়শই এমন খবর আমাদের চোখে পরে। বিভিন্ন দেশের নানান গল্পগাঁথায় ডাইনি নিয়ে প্রচুর কাহিনী রয়েছে এসব গল্পই ধিরে ধিরে আমজনতাকে ডাইনির প্রতি বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। বাধ্য করে শেখাতে যে, ডায়েন বা ডাইনিদের কোনো অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা আছে, এবং ডাইনিরা সমাজের ক্ষতিই করে থাকে। স্টার প্ল্যাস হিন্দি চ্যানেলে তো ডাইনির প্রতি জনগণের বিশ্বাস জাগাতে ' নজর ' নামে একটা সিরিয়াল পর্যন্ত হয়েছে। এইধরনের সিরিয়াল বা সিনেমার প্রভাব মানবজীবনে অনেক। ডাইনি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে না জানি কত অসহায় মহিলারা সামাজের চোখে অপরাধী হয়ে অত্যাচারিত হবে, হচ্ছেও। প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে এসব চললেও কোনো প্রতিবাদ,প্রতিরোধ নেই। এই প্রসঙ্গে একটি লজ্জাজনক ও নৃশংশ ঘটনার কথা আপনাদের শোনাই।

রাঁচির মান্দার ব্লকের কাঞ্জিয়া মারাইটোলি গ্রাম। এই গ্রামেই গত ৭ই অগাস্ট, ২০১৫ সালে পাঁচজন মহিলা কে পিটিয়ে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে একদল উন্মত্ত গ্রামবাসী।

উক্ত পাঁচজন মহিলার অপরাধ, তারা নাকি " ডাইনি"। রাঁচির এই গ্রামে কেউ ডাইনি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেনা, বরং গভীরে বিশ্বাস করে। ফলে যা হয় সেটা সত্যিই ভয়াবহ। ২০১৪ সালে এই মারাইটোলি গ্রামের পাশেই একজন মহিলাকে ডাইনি ঘোষণা করে হত্যা করার পরে গ্রামের এক ওঝার নিদান মতে সাইকেলের হ্যান্ডেলে উক্ত মহিলার কাটা মাথা নিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়।পুলিশ প্রশাসন কে সম্পুর্ন উপেক্ষা করেই। পুলিশ আসায় গ্রামবাসীরা জানায়, খুন করে বেশ করেছি। (তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ আগষ্ট ২০১৫)।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩ থেকে ২০১৫ র অগাস্ট পর্যন্ত ডাইনি সন্দেহে কিংবা বিশ্বাসে এই গ্রামে ১২৪ জন মহিলা দের নির্মম ভাবে হত্যা হয়েছে। আরেকটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে আরেকটি জঘন্য ঘটনার কথা শোনা যাক।

বাঁকুড়া সিমলাপাল অঞ্চলের চূড়ামণি মান্ডি এবং তার পরিবার গত প্রায় দেড়বছর হল গ্রামে ফিরতে পারছেন না। কারণ তিনি নাকি ডাইন বা ডাইনি। গ্রামের একজন

জানগুরুর নির্দেশে, পরিবারটিকে জমিজমা বিক্রি করে জরিমানাও দিতে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাঁদের ভিটেমাটিতে থাকার অধিকার নেই। বর্তমানে একটা আদিবাসী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অনুগ্রহে পরজীবির মত বেঁচে আছেন ওনারা। অদ্ভুত এই অবস্থা। প্রশাসন সব জেনেও অন্ধ সেজে বসে আছে।

আশ্চর্য হলেও, রাগ হলেও এটাই আমাদের ভারত।

প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব কান্ড ঘটলেও তারা নির্বিকার।

"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি"-র পুরুলিয়া শাখার সম্পাদক মধুসূদন মাহাতো, দীর্ঘবছর ধরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ জঙ্গলমহল এলাকায় যুক্তিবাদী বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিশেষ ভাবে ডাইনি সমস্যা সহ আদিবাসী এলাকার আরেকটি সমস্যা নাবালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজ মধুসূদন মাহাতো সহ কয়েকজন মুক্তমনা সহযোদ্ধারা নিরলস ভাবে কাজ করছেন। সম্প্রতি, মধুসূদন মাহাতো, তথ্যের অধিকার আইনে রাজ্যে সরকারের স্টেট ক্রাইম ব্যুরোর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে কত মানুষকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হয়েছে? সরকার লিখিত ভাবে জানিয়েছে এবিষয়ে কোন তথ্য তাদের কাছে নেই। ভাবা যায়! যেখানে তথ্যই নেই সেখানে প্রতিকার দুরাশা করাটা বোকামো।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনের দারস্থ হয়েও সুবিচার পাননি চূড়ামণি মান্ডি এবং তার পরিবার। এই অবস্থাই কি চলছে, চলবেও? প্রশাসন কি এভাবেই জেগে ঘুমাবে? কিছু আলোচনার সময়ে মধুসূদন মাহাতোর দাবী, কাউকে ডাইনি বলে দেগে দেওয়ার পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত আছে। দেখা যাচ্ছে, যেই বছর কম বৃষ্টিপাত বা অনাবৃষ্টির ফলে খরার প্রকোপ দেখা যায় সেবছরই ডাইনির ঘটনা বেশি শোনা যায়। পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মতন যায়গায় এমনিতেই চাষাবাদ খুব কম হয় বৃষ্টি বা জলের অভাবে। তাই কয়েকজন ধূর্ত ব্যাক্তি এই বিষয় টাকে হাতিয়ার করে। তাঁরা বুজরুক, প্রতারক ওঝা,গুণিন, জানগুরু ইত্যদিদের সাথে মিলে কোনো মহিলা কে ডাইনি ঘোষণা করে দেয় এবং সঙ্গে থাকে মোটা অঙ্কের জরিমানা। স্বাভাবিক ভাবে অনেকেরই সেই টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই বলে চলে অত্যাচার এবং গ্রামে একঘরে করে রাখার বিধান। সোজা কথা, উদ্দ্যেশ্যে, কোনো মহিলাকে ডাইনি বলে দেগে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার নোংরা চক্রান্ত। যেহেতু গ্রামগঞ্জে আজও ডাইনির ক্ষমতায় বিশ্বাসী (পড়ুন অন্ধবিশ্বাসী) মানুষের অভাব নেই তাই বিশ্বাসীরাও দল কোমড় বেঁধে নেমে পড়ে যাকে ডাইনি ঘোষণা করা হয়েছে তাঁর অথবা তাঁর পরিবারের ওপরে ক্রমাগত চাপ দিতে জরিমানার টাকা দেওয়ার জন্য।

যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞান আজকের মতন এতো উন্নত হয়নি সেসময় অজানা জ্বর বা রোগের প্রাদুর্ভাব কে অনেকে বোঙ্গা বা দেবতার অভিশাপ নয়তো ডাইনির কারসাজি ধরে নিতো। অবস্থা এখনো পালটায় নি। আজও প্রত্যন্ত গ্রামে সু-চিকিৎসার কেন্দ্র নেই। তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের ৭৩ বছর পরেও। আজও একশ্রেণীর মানুষের পরনে কাপড় নেই, হাতে রোজগার নেই, সু-চিকিৎসা নেই, পেটে খাদ্য দেওয়ার মতন অবস্থা নেই, পারিস্কার পানীয়জল নেই, বাসস্থান নেই, মাথার ওপরে ছাদ নেই। এই নেই এর রাজ্যে আছে শুধু প্রতারণা, বুজরুকি, ধর্মের সুড়সুড়ি। গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে থাকা দেশে নাগরিক অধিকার আজ খর্ব। আমজনতা তাঁদের সংবিধান স্বীকৃত ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। যে দেশে শুধুমাত্র ঘুষ দিয়ে কাজ করাতেই বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে যায় সেদেশের জনতা সু-চিকিৎসার সুযোগ না পেলে এবং সচেতনতার অভাবে এসব ওঝা,গুণিন, জানগুরুদের খপ্পরে পরে সর্বসান্ত হয় এবং ডাইনি ঘোষিত বলে অত্যাচারিত,লাঞ্ছিত হয় প্রতিদিন, প্রতিমূহুর্তে। আসলে পুরুষশাসিত সমাজের মাথারা নারী কে কোনো দিনই ' মানুষ ' হিসেবে দেখেনি কিংবা ভাবেনি। সর্বদাই ভেবেছে ভোগের সামগ্রী অথবা সংসার সামলানোর যাবতীয় কাজ করার একটা যন্ত্র।

প্রায় দুশো খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ডাইনিতত্ত্ব বা ডাকিনিতত্ত্বের রমরমা শুরু হয় এবং দ্রুত ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রেসিন্যান্ড স্কট নামক একজন ব্যাক্তি প্রকাশ করেন ' The Discovery of Witchcraft ' নামের গ্রন্থ টি। উক্ত বইটির মূল আলোচনা ছিল মানসিক রোগীদের ডাইনি বলে ঘোষনা করে সমাজ মিথ্যেই তাঁদের ওপরে অত্যাচার করেছে। স্কট এর বইটি প্রায় সর্বত্রই ধিক্কৃত

হয়েছিল সেসময়। এরও আগে ১৪৮৬ সালে খ্রিষ্টান ধর্মে পোপের নির্দেশে ' The Witche's Hammer ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মানসিক রোগীদের ডাইনি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই গ্রন্থেই বলা হয়েছিল ডাইনিরা সমাজের শত্রু, ওরা অশুভ শক্তি, তারা মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক জানে,সাধারণ মানুষ থেকে পশুপাখি দের ক্ষতি করে, নানান অসুখ তৈরী করে, রক্ত শুষে নেয়। তাই পোপের নির্দেশ ছিলো, ওদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ ওঁদেরকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে শেষ করে দেওয়া হোক। 'The Witche's Hammer ' গ্রন্থটির সময় থেকে বহুযুগ ধরে প্রকাশ্যে মানসিক রোগিণী অর্থাৎ মহিলাদের উপর বারে বারে আঘাত এসেছে যা আজও ক্রমবর্ধমান। এখন হয়তো ডাইনি ঘোষিত কোনো মহিলাকে জীবন্ত জ্বলিয়ে দেওয়া হয়না, কিন্ত যা যা অত্যাচার হয় সেটা কোনো অংশেই কম নয়। রাঁচির মারাইটোলি গ্রামের ঘটনাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, যা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই সমস্যার শেকড় কতটা গভীরে।

National Crime Record Bureau র তথ্য অনুযায়ী, সাল ২০০০ থেকে ২০১৬ র মধ্যে ডাইনি ঘটনায় অত্যাচারিত ও খুন হয়েছেন ২৫০০ জন মহিলা। এতো গেলো সরকারি হিসেবে। কিন্তু বিভিন্ন মানবধিকার বা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনষ্ক সংগঠনের দাবী সংখ্যাটা কয়েকগুণ বেশি। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাইনি অপবাদে শুধু ইউরোপেই মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল ৮০ হাজার মহিলাকে। এই জঘন্যতম কান্ড শুধু ইউরোপ নয়, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড সহ অনেক দেশেই ছিল যথেষ্ট আকারে।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা যাক বিখ্যাত লেখিকা প্রয়াত মহাশ্বেতা দেবীর। উনি দীর্ঘসময় ধরে আদিবাসী দের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের দাবীতে প্রচুর কাজ করেছেন, বিশেষ ভাবে ডাইনির ঘটনা নিয়ে। আরেকজন ব্যাক্তি হলেন ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মহাশয়। উনিও ডাইনি নামক একুশ শতকের লজ্জাজনক কান্ড নিয়ে যথেষ্ট কাজ করেছেন। কিন্তু ওনার কিছু বক্তব্য নিয়ে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। যেমন শ্রী বাস্কের একটি লেখা ' আদিবাসী সমাজের সংস্কার ও কুসংস্কার ' এর এক যায়গায় উনি লিখেছেন- "এটাকে (ডাইনি) কুসংস্কার কিংবা অন্ধ বিশ্বাস যাই বলি না কেন, ভারতবর্ষের প্রায় সব আদিবাসী সমাজেই এই ক্ষতিকারক বিদ্যার চর্চা দেখা যায়। যদিও সকলেই জানে এর প্রয়োগ অসামাজিক তবুও তারা এর মোহমুক্ত হতে পারেনি। আদিবাসী সমাজের কাছে এটা নিদারুণ অভিশাপ"।

অর্থাৎ, শ্রীবাস্কের ধারণায়, ডাইনির মত একটা ক্ষতিকারক বিদ্যার চর্চা চলছে। তাঁর মানে উনিও মনে করেন ডাইনি বা ডাইন বা ডায়েন বাস্তবে হয় এবং তাঁদের সত্যিই কোনো অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। গভীর দুঃখের সাথে জানাতে বাধ্য হচ্ছি ডাইনির প্রতি এমন অন্ধবিশ্বাস থাকলে, যতই মিটিং মিছিল আন্দোলন কিংবা লেখালিখি হোক না কেন সমস্যাটা মোটেই দূর করা সম্ভব নয়। ডাইনির প্রতি গভীর বিশ্বাসও রাখবো আবার এর বিরুদ্ধে কলম চালাবো এটা সোজাসাপটা স্ববিরোধীতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আরো দুঃখ পাই যখন ব্যাক্তিগত ভাবে পরিচিত কয়েকজন বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মীরাও মনে করেন এই পৃথিবীতে সত্যিই ডাইনির অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাঁরা নিজের ক্ষমতার বলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে একদা পত্রপত্রিকায় ঝড় তোলা স্বঘোষিত ডাইনি ইপ্সিতা রায়চৌধুরী' র কথা। ১৯৮৮ সালে উনি সাড়াজাগিয়ে এসেছিলেন। সেসময় পত্রপত্রিকায় ওনাকে নিয়ে গাদা গাদা নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছিল। কয়েকটি পত্রিকাতো ওনাকে ভালো ডাইনি আখ্যা দিয়ে প্রশংসায় ভরা লেখা পর্যন্ত লিখেছে। কিন্তু তারপরে যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মীদের দ্বারা ওনার বুজরুকি ফাঁস হয়। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৮ সাল নাগাদ বিভিন্ন পত্রিকায় উনার বুজরুকি ফাঁসের নানান মুখরোচক খবর প্রকাশিতও হয়।

কোনো ওঝা,জানগুরু,গুণিন, সৎসখা, দিখলি ইত্যাদিরা ডাইনি সন্দেহে কোনো মহিলার ওপরে অত্বাচার করলে বা ডাইনি বলে ঘোষণা করলে, তাঁদের জেলে ঢোকাবার জন্য আমাদের দেশে বেশ কয়েকটা ভালো ভালো আইন রয়েছে। কিন্তু আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা এই দেশে টাকা এবং রাজনীতিক পরিচিতি থাকার সুবাদে অপরাধীরা অনেক বে-আইনি কাজ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরায় শুধুমাত্র জনগণের আইন বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে। সরকার চাইলেই আইন কে মলাটবন্দি অবস্থায় ফেলে না রেখে, জনগণ কে এই বিষয়ে সচেতন করতে পারে। আমজনতা এইসব আইনের ব্যাপারে সঠিক ভবে জানলে নিজেরাই এইসব প্রতারকদের জেলে ঢোকাতে পারেন অনায়াসেই।

"নারী সুরক্ষা ও নির্যাতন প্রতিরোধ বিল-২০১১" নামক এই বিলের 4 নং সেকশনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কোনো মহিলাকে ডাইনি ঘোষণা করে গ্রামের অন্য সদস্যদের উস্কালে বা ডাইনি ঘোষিত মহিলার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে নির্যাতন ও শাস্তি দিলে অপরাধীদের সর্ব্বোচ্চ সাজা সাত বছরের জেল সঙ্গে কুড়ি হাজার টাকা জড়িমানা। এছাড়া ঝাড়খণ্ড সরকার পাশ

করিয়েছে "ডাইনি প্রতিরোধ আইন- ২০১১", ছত্তিশগড় সরকার এনেছে "তোনাহি প্রতদ্ম নিভারণ আইন- ২০০৫", বিহার সরকার এনেছে "ডাইনি প্রতিরোধ আইন- ১৯৯৯"।

"অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি" র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নরেন্দ্র দাভোলকর, যাকে মৌলবাদী কট্টরপন্থীরা নৃশংশ ভাবে হত্যা করেছিল, তিনি ২০০৩ সাল থেকেই একটা আইন কে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। অবশেষে "The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act 2013" লাগু হয়। তাছাড়া "The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954", এবং

"The Drugs and Cosmetics Act 1940" এর মতন বেশ কিছু কঠোর আইনও এই দেশে রয়েছে।

সাংসদ প্রবর্তিত The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954, আইনটি ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং ১ মে ১৯৫৪ তে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যার দ্বিতীয় অংশের, প্রথম অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর বাদে ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য।

The Drugs Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 আইনের সংশোধন হয় ১৯৬৩ তে। এই আইনের ৯(এ) ধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে, এই আইন ভঙ্গকারীদের Cognizable Offence হিসেবে গন্য করা হবে। অর্থাৎ কেউ কেউ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের না করলেও পুলিশ কোনোও ভাবে এই অপরাধ সংগঠিত হয়েছে বলে প্রাথমিক জানার ভিত্তিতে কোনো অভিযুক্তকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে (Notwithstanding anything contained in The Code of Criminal Procedure 1898 an Offence Punishable under this Act shall be Cognizable)..

"The Drugs And Cosmetics Act 1940" Amendment GSR 884 (E)..বিভিন্ন সময়ে এই আইন সংশোধন হয়েছে। যেমন ১৯৫৫, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৪ এবং শেষ এমেন্ডমেন্ট হয় ২০০৯ সালে। ১৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে ভারতের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রের 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর'। এই আইনে এবার থেকে শাস্তির পরিমান আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা।

কয়েকজন মুক্তমনা, যুক্তিবাদী মানুষ এই রাজ্যে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে মহারাষ্ট্রের ধাঁচে একটা জোরালো বা কঠোর আইন প্রণয়ণের দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে সরব। ইতিমধ্যে উনারা আইনের খসড়া জমা দিয়েছেন State Law Commission এর দপ্তরে। এনারা যেই আইনটি আনতে চান তার নাম "The West Bengal Prevention of Superstition and Black Magic Practices Bill ২০১৬।" আপাতত এই আইনটি লাল ফিঁতের ফাঁসে আটকে রয়েছে সরকারের উদাসিনতার কারনে।

আইন আছে কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ নেই। গোদীলোভো কোনো রাজনৈতিক দলই চায়না আন্তরিক হতে, তাই তাঁরা ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই আমজনতার তথাকথিত ধর্মবিশ্বাস কে আঘাত করতে নারাজ। নইলে সরকার চাইলে কড়া হাতে এইসব অমানবিক ও জঘন্য কাজ অনায়াসেই বন্ধ করতে পারে ব্যাপক আকারে সচেতনতার প্রচার ও প্রাসারের মাধ্যমে সঙ্গে ওঝা,জানগুরু ইত্যদিদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করে। এর সাথেই প্রয়োজন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সু-চিকিৎসার কেন্দ্র গড়ে তোলা। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরে আজও বহু গ্রামগঞ্জে সু-চিকিৎসার কেন্দ্র নেই, নেই পর্যাপ্ত ওষুধ এবং ডাক্তার। তাই তো অজানা রোগ, জলবাহিত রোগ ইত্যাদিকে ডাইনির প্রকোপ আখ্যা দিয়ে স্বার্থলোভী ওঝা,গুণিন, জানগুরুদের প্রতারণা অবাধে চলছে।

ডাইনি বলে বাস্তবে কিছুই নেই ওসব গল্পের বই এবং সিনেমা সিরিয়ালেই সম্ভব। এইধারণা কে মনে গেঁথে নিলে এবং আন্তরিক হলে অবশ্যই বন্ধ করা যাবে এই ডাইনির ঘটনা গুলোকে। এর জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন কর্মীদের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে নাটকের মাধ্যমে, কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, প্রচার মাধ্যমে, ব্যাপকভাবে ডাইনির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নিতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। সঙ্গে প্রশাসনের উচিৎ নজর রাখা কোনো গ্রামে কাউকে ডাইনি ঘোষণা হওয়ার খবর পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং যে বা যারাই কোনো মহিলাকে ডাইনি আখ্যা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়া।

দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান।
email : deyishan@yahoo.in

ফিচার

আমি কেন নাস্তিক হলাম (১)

লিখেছেন- মোনালিসা

বাড়িতে নাস্তিকতা নিয়ে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলে আমার সাথে মা বাবা সহ বাকিদের।

ছোটবেলায় বাড়ির সকলের ঠাকুর ভক্তি দেখে দেখে আমিও যন্ত্রের মত পুজো করতাম।কত কি চাইতাম।এখন সেইসব ভাবলে হাসি পায়।

আমার মতের পরিবর্তন হতে শুরু করে ২০১২ সাল নাগাদ। যে বছর পার্ক স্ট্রিট রেপ কেস টা ঘটে।এই ঘটনাটা আমার বিশ্বাসে প্রথম কুঠারাঘাত ঘটায়।তার পর দিল্লির ঘটনা ঘটলো। মেয়ে টাকে যখন সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হলো আমি মনে প্রাণে প্রার্থনা করেছিলাম পুজো করেছিলাম যে তোমরা ওকে বাঁচিয়ে দাও।

নাহ আমার কথা ঠাকুর শোনেনি। যার কান নেই যার প্রাণ নেই সে আর শুনবে কি করে।সেই দিন আমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছিলাম।আমি আর কখনও কোনোদিন কোনো পাথর খন্ডকে মানবো না।এবং বাড়ির লোককেও বলেছিলাম। যথারীতি তারা আমার মুখ বন্ধ করেছে,আমায় বকাঝকা করেছে।আমি আমার বিশ্বাস থেকে সরে আসিনি আজও।

আর যেহেতু বাড়িতে সবাই পুজো করে আমি একা এসব মানিনা।তাই বাড়ির লোকের সাথে প্রায় অশান্তি লাগে।

বাট লাগে লাগুক।যেটা ভুল সেটাকে মেনে নিয়ে নিজের কাছে ছোট হওয়া সম্ভব নয়।

আর একটা ব্যাপার সালটা ছিল ২০১২।তার পরের বছর আমার উচ্চমাধ্যমিক ছিল।যেহেতু বাড়িতে নাস্তিকের মত কথা বলছি,যুক্তি দেখাচ্ছি সরস্বতী পূজায় অঞ্জলী দেবনা,উপোস করবো না বলছি বাড়ির লোক আমায় বলেছিল তুই এরম করছিস তো Hs ভালো হবে না। গ্রাজুয়েশনে ভালো ফল হবে না।এই সবও শুনতে হতো,পরীক্ষা খারাপ হওয়ার ভয় দেখাতো।আমি ওদের শুধু একটা কথাই বলি।তোমাদের ভগবান মেয়েটার জীবন শেষ করে দিল কি করে।তোমরা তো বলো তোমাদের ভগবান সবার মঙ্গল করে।তবে ওর ক্ষেত্রে এটা কি হলো।এইসব প্রশ্নের উত্তর নেই তাদের কাছে জানি।যাই হোক তারপর

আমি নিজের চেষ্টায় দেখিয়ে দিয়েছি ওদের, ভগবানের পায়ে মাথা না ঠেকিয়ে ও নিজের ইচ্ছাশক্তি,আত্মবিশ্বাসের জোরে সব কিছু সম্ভব।পাথরে না বিশ্বাস করে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখাটা অনেক বেশি প্রয়োজন।

আমি কেন নাস্তিক হলাম (২)

লিখেছেন- বিতান সানা

আমার নাস্তিক হওয়ায় পেছনে আমার বাবার অবদান আমি অস্বীকার করতে পারিনা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি বুঝিয়েছেন এই পৃথিবীর সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট গতিতে ঘটছে। কিভাবে সেটি ঘটছে, সেটা বিজ্ঞান ব্যাখা করেছে। বানর থেকে আদিম মানুষ আর তারপর আজকের এই আমরা, এটা সবটাই ঘটেছে বিবর্তনের ওপর ভর করে, অলৌকিক কিছুর জন্য নয়। ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে নিরীশ্বরবাদের পরিবেশ ছিলো।

ছোটবেলায় আমার হাতে খড়ি হয়নি, এমন কি আমি সরস্বতী পুজোর আগেই কুল খাওয়া পছন্দ করতাম। বাড়িতে নিষেধ ছিলোনা, এমন কী সরস্বতী পুজোর দিন পড়াশুনাও করতাম। বাড়িতে কোনো ঠাকুরের ছবি ছিলো না, আজও নেই। বাবাকে মাকে কোনদিন বাড়িতে বা মন্দিরে গিয়ে পুজো করতেও দেখিনি। এই সবকিছুই আমার ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। একটু বড়ো হয়ে যখন মার্ক্সবাদ পড়েছি, গভীরে গেছি, জেনেছি ঈশ্বর, আল্লাহ সবই ক্ষমতাবান শ্রেণীর তৈরি, যা দিয়ে তারা দুর্বল শ্রেণীকে শোষণ করে। প্রতিটা ঘটনাই আমাকে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে ঈশ্বর, আল্লাহ বলে আসলেই কিছু নেই, সবটাই আসলে কিছু মানুষ ক্ষমতার সিংহাসনে বসে কাঠি নাড়ছে। আমরা তাদের অঙ্গুলিহিলনে চলছি মাত্র।

একদিন বাবার বুক সেল্ফের পুরোনো বই ঘাটতে ঘাটতে প্রবীর ঘোষের বই পেয়েছিলাম, " অলৌকিক নয় লৌকিক ২য় খন্ড"। ব্যাস, এরপর সবকটি খন্ড জোগাড় করে গোগ্রাসে গিলেছি। " যে কটি doubt ছিলো, তাও ধুয়ে সাফ হয়ে গেল প্রবীর ঘোষকে পড়ে। সমস্ত কিছু বিচার করে বুঝলাম স্বর্গ, নরক, আশীর্বাদ, অভিশাপ, আগের জন্ম, পরের জন্ম সবই মানুষের বানানো ভ্রান্ত ধারণা। আমরা চাইলেই আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারি, তাও আবার গ্রহ, রত্নের পাথরের আংটি না পরেই। দরকার উপযুক্ত বিজ্ঞানমূলক, যুক্তিমূলক শিক্ষা, বিপরীত মতের সম্মান করার মানসিকতা আর সমাজের প্রচলিত সমস্ত সত্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার সাহস।

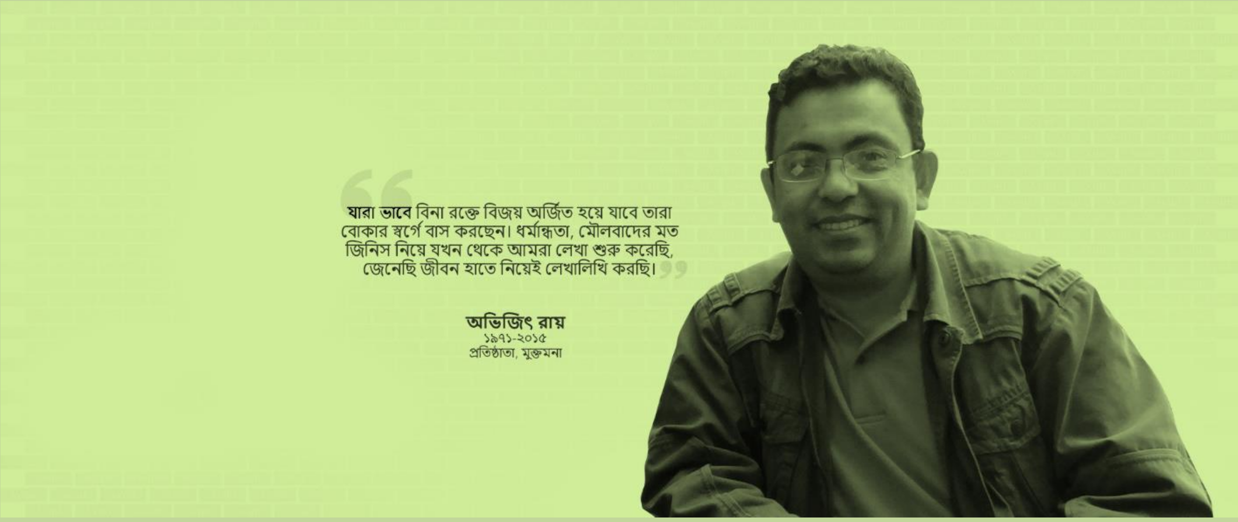
ফিচার: ২

ওজন কমাতে লেবুজল?

লিখেছেন- শুভায়ু দাস

জামা পেটে গিয়ে আটকে যাচ্ছে ? ডাক্তার ক্রমাগত ওজন বৃদ্ধির লাল সংকেত দিয়ে যাচ্ছেন ?

পাশের বাড়ির মুখুজ্জে দা কি বলছে লেবু দিয়ে গরম জল কিম্বা শুধু গরম জল খেতে,এক্কেবারে এক হপ্তায় কিলো দশেক কমবেই! আজ্ঞে না ওজন এইভাবে কমে না আর একটু ঠিক করে বললে চর্বি এভাবে কমে না। চর্বি কমানোর জন্য দরকার ক্যালোরিক ডেফিসিট। গোদা বাংলায় বললে আপনার প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় ক্যালোরির তুলনায় কম ক্যালরির খাদ্যাভাস। সঠিক অনুপাতে প্রয়োজনীয় macronutrient(প্রোটীন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট) ও micronutrient (ভিটামিন মিনারেল) খাদ্যাভাসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে তবেই ওজন কমানো সম্ভব। তবে গরম জল কিংবা লেবুর কি কোনো উপকারিতাই নেই! লেবু তে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে এছাড়া গরমজলের সাথে লেবু খেলে হজম ক্ষমতা বাড়ে এবং মলত্যাগ পরিষ্কার হয়। সুতরাং গরম জল এবং লেবু সেবন আপনার নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের অঙ্গ করে তুলুন। তবে, ওজন কমানোর জন্য ক্যালোড়িক ডেফিসিট-ই আপনার গন্তব্য।



কবিতা:

রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

-জামাল আনসারী

আমার ভাই-এর তাজা রক্তে রাঙানো
স্বর্ণাক্ষরে লেখা নাম --অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।
সেই অমৃত নাম, আমি কি জীবনে- মরণে কখনো ভুলিতে পারি?
না। তা আমি কখনো ভুলিতে পারিব না।
'নক্সীকাথাঁ বোনা রাতে স্বপ্নের প্রভায়' রঙিন
নক্ষত্রের মতো জ্বলে ওঠে,অমর ভাষা শহীদ --
আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আব্দুস সালাম,
আব্দুল জাব্বার,এবং শফিউর রহমানের নাম।
বঙ্গ মাতার চির বীরসন্তানদের আত্ম বলিদানে
আমার মায়ের মুখের ভাষা, মাতৃভাষার
কৌস্তুভ মৃগসম সৌরভ পৌঁছে গেছে
বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে ত্রিপুরা, আসাম,
দক্ষিনের কর্ণাটক, সুদূর দীপপুঞ্জ আন্দামান।
বাংলার রামধনু বিকেলের আকাশ জুড়ে,
বর্নে- গন্ধে ছড়িয়ে আছে একুশে ফেব্রুয়ারির নাম।

একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু ক্যালেন্ডারের শুকনো পাতায় লেখা একটা দিন নয়।
একুশে ফেব্রুয়ারি একটা বিপ্লবের নাম।
জোর করে চাপিয়ে দেওয়া পাকিস্তানি উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে
আপোষ হীন সংগ্রমের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ।
একুশে ফেব্রুয়ারির হাত ধরে একবিংশ শতাব্দীর
ঝড়-ঝঞ্জা অতিক্রম করে দুরন্ত বেগে ধাবমান ষ্টীমার,
বিশ্বের বাইশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জয়গান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো 'ফ্যাকাসে দেওয়ালের রাত্রিমাখা গন্ধে'
মর্মরিত সেকালের পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর
পৈশাচিক গোলা বারুদের উল্লাসী সন্ধ্যে।
রৌদ্রছায়া উল্কি আঁকা গ্রাম বাংলার নিকানো উঠানে,
কাঠের পিঁড়েতে বসে এখনো শোনা যায়....
ঐ দূর নীলচে আকাশে বেতারে ভেসে আসা,
সবুজ ধানের মাঠ,জ্যোৎস্না আলোকিত নদী বক্ষের
ভাটিয়াল, মুর্শিদি গানের চির পরিচিত সেই সুর।

আমার মায়ের সযত্নে লালিত যে ভাষা
সেই ভাষার অমৃতোপম নাম বাংলা ভাষা।
কি বৈচিত্র্যময় তার কথন শৈলী?

রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী,ঝাড়খণ্ডী,রাজবংশী উপভাষা,
সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের এই ভাষাতেই মিটে মনের আশা।
এই ভাষাতেই ধ্বনিত শিউলি ঝরা সকালে
"জনগনমন-অধিনায়ক জয় হে"
"আমার সোনার বাংলা-আমি তোমায় ভালোবাসি
"দুটি সার্বভৌম দেশের জাতীয় সংগীতের ঐক্যবোধে,
এপার বাংলা অপার বাংলা ভাই ভাই আজও পাশাপাশি।
আমি গর্বিত এই অমর বাংলা ভাষার তরে,
বাংলার বিজয় পতাকা বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম,
পৌঁছে দিয়েছে প্রাচ্য -পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে।
ইউনেস্কো রেখেছে বাইশ কোটি বাংলা ভাষীর মান,
একুশে ফেব্রুয়ারি তাই পেল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মান।
আমার মায়ের মুখের ভাষা,আমার মাতৃভাষা,
যাদের আত্মবলিদানে গৌরবান্বিত বাংলানাম,
সেই অমর বাংলা ভাষা শহীদরা অন্তরে পেয়েছে ঠাঁই
অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানায় শহীদদের শত কোটি প্রনাম।

তারিখ ২১. ০২. ২০২০
গ্রাম করনবাঁধ, পোস্ট ঝাঁপড়া,
জেলা পুরুলিয়া

কবিতা:

মাতৃভাষা

-সাহেব ইসলাম

সব কিছুর চেয়েও দামি
মোদের বাংলা ভাষা
সেই ভাষাতেই আছে
মোদের সুখের আশা।
সবার উপর মাতৃভাষার
হয়রে ভাই ঠাই
দিনরাত মনের মাঝে
তাকে খুঁজে পাই।
জড়িয়ে আছে এই ভাষা
মোদের প্রশ্বাসে
মিশে আছে আনন্দে
আর উচ্ছাসে।
এই ভাষাতে আপন মাটির
গাইবো মোরা গান
শপথ নিচ্ছি সারা জীবন
রাখব তার মান।

কবিতা:

মুক্ত

-প্রদীপ চক্রবর্তী

মানুষ যখন আদিম ছিল
ছিলনা কোনো বারণ,
সবকিছুই ঘটত নাকি
ভগবানের কারণ।

ভূমিকম্প,অতিমারী
আসত যখন বন্যা,
ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে
মানুষ ধরত কান্না।

আমরা আজকে আধুনিক
মনটা তো নয় পরিস্কার,
আধুনিকতার মোড়ক ঢেকে
পালন করছি কুসংস্কার।

যুক্তি দিয়েই দুনিয়া শুরু
যুক্তি দিয়েই শেষ?
সংস্কার মুক্ত সমাজ হলে
এগিয়ে যাবেই দেশ।

মনোরা পিক্
নৈনিতাল ,উত্তরাখন্ড

কবিতা:

গ্রহণে সবকিছু করুন

- রাজা দেবরায়

যেকোনো গ্রহণে খাওয়া যায়,
প্রতিদিনের কাজ করা যায়।
যদি ভাবেন গ্রহণে আলো কম,
তাই ক্ষতিকর জীবাণু দেখাবে দম!
তবে জেনে রাখুন সেটা আসল ভ্রম!
কারণ একটু বোঝার চেষ্টা করুন,

সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে একটু ভাবুন।
গ্রহণের আলো কি আসলে
রাত্রিবেলা থেকেও কম ?
রাতে যদি জীবাণুরা দেখাতে না পারে শক্তি,
কুসংস্কার মন নিয়ে কেনো করবো ভক্তি?
তাই গ্রহণে বিন্দাস সবকিছু করবেন,
আর অন্যদেরও এই কথাটা বোঝাবেন

কবিতা:

ইনফিনিটি ক্রুসেড

-শ্রীকুমার মন্ডল

জন্মের পর ক্ষনিকের মধ্যেই আমি আমার মনুষ্যত্ব হারিয়েছি।
কখন?
যখন, সদ্যজাত অবচেতন মস্তিষ্কে তোমরা ধর্ম ও কুসংস্কারের অসহনীয় বিষ প্রয়োগ করেছ।
জ্বালায় ছটফট করতে করতে কতনা যন্ত্রণা পেরিয়েছি।

একটুও মায়া হয়নি তোমাদের।
হওয়ার কথাও নয়।
কারণ, সেই বিষের জ্বালায় একই ভাবে তোমরাও জ্বলেছ,
তোমাদের সেইসব পূর্ব পুরুষদের সৌজন্যে,
ক্রুসেডের তরোয়াল পুরুষত্ব কেটে নিয়েছিল যাদের।

ঠিক যেমন আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি তোমাদের জন্য।
এটাও যথেষ্ট নয়।
থমকে থাকবে না এ-অবধি,
কারণ আমিও তো মারব আমাদের সন্তান দের।
ঠিক তোমাদের মত।
সমস্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মরবে একই ভাবে।
হয়তো বা এই জ্বালা সহ্য করেও বাঁচবে কিছু মানুষ,
তবে তা খুবই সামান্য।

ধ্বংস হয়েছে এই প্রজন্মের ক্রিয়েটিভিটি।
সেই জ্বালায় বিনষ্ট হয়েছে আমাদের ছোট্টো হৃদয়ের সেনসিটিভিটি।
শিরায়, ধমনীতে গিয়ে শরীরের সমস্ত রক্তকে বিষিয়ে দিয়েছে সেই বিষ।
সেই বিষেরই chemical reaction এ যখন আমি আমার বিচার, বিবেক, জ্ঞানের তৃষ্ণা, কৌতূহল, উপলব্ধি, সচেতনতা সমস্ত হারিয়েছি সমূলে,

তখনই আমার ভেতরে থাকা সেই ধর্মীয় দানব জন্ম নিয়েছে,
ধ্বংস করেছে এই জীবনের মোটিভিটি।

আমি এখন এক সেন্স হীন জম্বী, মানুষের মত দেখতে এক শয়তান।
যেই শয়তান এখন ঈশ্বর নামক এক অলীক কল্প বস্তুর দাস।
ওই ঈশ্বর নাকি উপাসনা চায়, সেবা চায়।
ভেদাভেদ চায়, রক্ত চায়, দাঙ্গা চায়, হিংসা চায়, মাথা চায়,
চোখ বেরকরে থাকা বিভৎস কাটা মাথা,
শুধু নিজেকে করতে প্রমান।

ওই ঈশ্বর নাকি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরীক্ষা নেয়।
আর যে ওই পরীক্ষায় ফেল করে, সে নাকি মৃত্যুর পর নরকে যায়,
যাতে আরো হিংসা, আরো যন্ত্রণা, আরো কষ্ট দেখে দেখে পরীক্ষার জন্য আরো উপযুক্ত হয়।
ঠিক যেমন জেলে ক্রিমিনালদের সাথে থাকলে, নিরীহ মানুষও ক্রিমিনাল হয়ে ওঠে,
আর প্রতিদানে সমাজে আরো বহুগুন হিংস্রতা ফিরিয়ে দেয়।

ঈশ্বরই শয়তানদের কেন্দ্রীভূত প্রাণ।
আর আমি আজ ওই পরমেশ্বরের পদসেবায় নিযুক্ত।
হ্যাঁ আমি অপরাধী, আমি শয়তানের প্রাণকেন্দ্রের পূজারী।
কিন্তু তোমদের ওই বিষ।
সেই বিষে, আমি আমার সচেতনতা হারিয়েছি।
হারিয়েছি অপরাধ বোধ।
জানিনা, যে আমি নিজেই এক মস্ত শয়তান।

কোথায় সেই গুটি কয় মানুষ, যারা বিষের জ্বালা সহ্য করেও বেঁচেগেছে?
এক্সপোনেন্সিয়াল হারে বিস্তৃত হচ্ছে ঈশ্বরের সাম্রাজ্য।
ওই সামান্য কি পারবে, আমাদের মত অসংখ শয়তানের মাঝে মনুষ্যত্বকে টিকিয়ে রাখতে?
ওই সামান্য কি পারবে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে আমাদের অপরাধ?
ওরা কি পারবে, সেই সচেতনতাকে ফিরিয়ে আনতে,
যা ধর্মের পদতলে হারিয়েগেছে?

স্কলার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
পূর্ব মেদিনীপুর

শুভ রক্ষণ দিবস

-শ্রেয়সী মল্লিক

উত্তাপই যে প্রাণের রক্ষক এই আদত কথাটার সশব্দ বিজ্ঞাপনের জন্যই বোধহয় রাখিবন্ধন দিবসের মধ্যাহ্নে অগ্নিপ্লাবী হয়েছে দিনমণি। কিন্তু ধূমপিপাসু জীব হবার সুবাদে ঠান্ডা হল ছেড়ে রোদে তেঁতে ওঠা করিডরে একবার আসতেই হল অনিকেতকে।একটু আগেই শেষ হয়েছে তার বই প্রকাশ অনুষ্ঠান।এই উপন্যাসটার পটভূমি ডুয়ার্স। তাই সেমিনারের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস প্রকাশেরও বন্দোবস্ত করেছিলেন তার এই পুরনো কলেজের বিভাগীয় প্রধান। আপত্তি করেনি অনিকেত। সত্যি কথা বলতে উত্তরবঙ্গের এই মফঃস্বলী কলেজটায় জীবনের প্রথম চাকরি না হলে অনিকেতের কলকাতা কাতর কলমে এমন পাহাড়ি নিস্বন শোনা যেত না। চার বছর ডুয়ার্স যাপনই অনিকেতের শিল্প-পাকশালায় স্বাদ বদল ঘটিয়েছে,প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস লিখেছে সে। তাই এখানে বই প্রকাশ অনিকেতের কাছে খানিকটা ঋণশোধও বটে।

মাঠের প্রান্ত থেকে রাখি উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে মেয়েটা, লক্ষ্য গোলপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ান সহপাঠী, যে কিনা প্রাণপন চেষ্টায় সপ্রতিভতা বজায় রাখতে চাইলেও মুখের আলোগুলো নিবে যাচ্ছে একটা একটা করে। অজান্তেই তার অভিব্যক্তির ময়নাতদন্ত চলছে লেখকের চোখে। ছেলেমেয়ে দুটো যেন ওদের বয়স ফিরিয়ে দিচ্ছে অনিকেতকে। দীর্ঘ সুখটানের সঙ্গে সঙ্গে সদ্য তারুণ্যের তোরণে পা রাখার সুখসময়টাকেও প্রশ্বাসে আগলে নিল ও।

মাস্টার বাবু চিনতে পারতছ?

চমকে উঠল অনিকেত।

প্রখর সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে যে তরুনী তাকে দেখলে মনে হয় অপটু শিশ্পীর হাতে তৈরি ডাকিনীর টেরাকোটা মূর্তি। মুখটা বেঢপ বাঁকা চোরা,নাক চ্যাপ্টা।এ মেয়ের বাকশক্তি শুধু মুখেই আটকে নেই,চোখ ও সে অধিকারের ঝান্ডা গেড়েছে। কপালের রেখাগুলি চলতে চলতে হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলেছে ক্ষুব্ধ কোনো বিক্ষোভে। ...ভামর!

ইস,কি রোগা হয়ে গেছ গো ! শুনলাম আজকে তোমার বই বার হবে,তাই আসলাম।খালি হাতে আসি নাই,এমন পুন্ন দিন।কই হাতটা দাও। চারপাশের বাতাস কি কমে এল হঠাৎ! অনিকেতের শিরায় শিরায় যেন উইপোকা লেগেছে।কটছে কুরকুর। ষড়ঋতুর হিসাব গুলিয়ে গেল নাকি পৃথিবীর প্রৌঢ় মস্তিষ্কে,নইলে এত শীত করছে কেন?

পরিশীলনের প্রলেপ মাখা,সারস্বত চর্চার প্রতিশ্রুতি ভরা অনিকেত বসুর নরম হাতটা কোন এক চুম্বকের টানে ভামর প্রামাণিকের খড়ি ওঠা খসখসে আঙুলের ফাঁকে আটকে থাকা রাখির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।তিন বছর আগে ঠিক এভাবেই ভামরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এই কলেজের অধুনা প্রাক্তন অধ্যাপক।প্রথম চাকরির স্বাধীনতা, পরিবার ও বাগদত্তার কাছ থেকে দূরে নির্জন পরিবেশ কেমন যেন মত্ত করে ফেলেছিল অনিকেতকে। তাই কলেজের বাইরে চা রুটির দোকানের মালিকের মেয়ে ভামরের মধ্যে উত্তেজক উপাদানের নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও সেই তখন অনিকেতের তন্বী শ্যামা শিখরদশনা। তোকে নিয়ে কবিতা লিখব ....তুই আমার অভিমানী তিস্তা নদী...ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি _এরথেকে বেশি পরিশ্রম করতে হয় নি ষোল বছরের ভামরকে ভোলাতে।

আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবা ত মাস্টার বাবু, তোমার বাড়ি কাজ করব, তুমি শুধু আমাকে কবিতা শুনাবা ...... কলকাতার কলেজে অনিকেতের ট্রান্সফারের কথা শুনে কান্নার দমক ঠেলে এটুকুই বলতে পেরেছিল ভামর। মাস্টার বাবুর মধ্যে জেগে ওঠা উদ্দাম আদিম পুরুষ তখন কলকাতার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জীবনের দরজার বাইরে আত্মহত্যা করেছে।ভামরের চোখে আর নিজের সর্বনাশ দেখতে পায় নি অনিকেত,তার দেহে মনে ঘরে ফেরার গান, চৈত্রের বস্তাপচা শেষ প্রহর তখন রাঙা আলো হারিয়ে ধূসর।কদিন পর এসে তোকে নিয়ে যাব ভামর, তোকে ছেড়ে থাকতেই পারব না এটুকু অভিনয় করতে হয় বলেই না মনীষীরা বলে গেছেন জীবন আসলে রঙ্গমঞ্চ।

এরপরও অবশ্য ভামরের খোঁজ রেখেছিল অনিকেত। এখানকার বন্ধুদের থেকে জেনেছিল বাবা মারা যাবার পর ওদের দোকানটা উঠে গেছে। এবারের উপন্যাসটা লেখার সময় ডুয়ার্সের বন পাহাড়ের মাঝখান থেকে ভামরকে মুছে ফেলতে খুব দামী ইরেজার লাগেনি লেখকের।

তুমি... মানে তুই আমাকে রাখি পরাবি!

হ্যাঁ গো, ছোটবেলা থেকে শুইনে আসতেছি রাখি পরাইলে নাকি রক্ষা করে। তুমি আমারে যা বাঁচান বাচাইলা, রাখি ত পরাইতেই হবে।

অসংখ্য লূতাতন্তুর মাঝে ফেঁসে গেছে অনিকেতের স্বরযন্ত্রটা। শুকনো পাতার মতো খরখরে গলায় বলল,কি যা তা বলছিস, আমি আবার তোকে কবে বাঁচালাম?

দোকানটা উইঠে যাবার পর রান্নার কাজ নিলাম এক বাড়ি। সেখানে আমারে দেখলে দাদার নাল গড়ায়।বলে আমারে পাইলে নাকি বৌদি রে ছাইড়ে দিবে। অনেক দিন থেকেই অসভ্যতামি করতেছিল, কিছু বলি নাই গো,কি জানি আমারও বুঝি নেশা ধইরে গেছিল।

সেদিন ফাঁকা বাড়ি পায়ে আমারে বিছানায় বসায়ে দাদা যখন আদুল গা হল... বুকের কালো লোম আর কেন্নোর মত হাতের শিরা গুলি দেইখে তোমার চেহারাটা ভাইসে উঠল চোখের উপর।ফর্সা জামাকাপড়গুলা খুললে দুজনেই এক। অমনি দিলাম যম কামড়। হাতের একেবারে মাংস উঠায় নিছি গো। শেষ গিঁটটা বাঁধতে বাঁধতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল ভামর।

তারপর একটা সস্তা দামের ক্যাটক্যাটে রঙ রাখির ফাঁস ছড়িয়ে পড়ল মোহময়ী ডুয়ার্সের কোণ থেকে কোণে। তিস্তার প্রতিটা বুদ্বুদে। অনেক হাততালির মধ্যে সদ্য ফিতে কাটা উপন্যাসটা র খুদে কালো অক্ষরে অক্ষরে। প্রতিটা সুখী অস্তিত্বের সুখ ছিঁড়ে দিয়েই শেষ হয় ভামর প্রামাণিকদের রাখিবন্ধন উৎসব।

এই বাঁধনে আগুনের গন্ধ। রক্ষক দীর্ঘজীবী হোক।

পারমিতার যুদ্ধজয়

-বিতান সানা

আজ ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ। নৃপেনবাবুর আজ পেনশনের টাকা তুলতে যাওয়ার দিন। প্রায় একবছর হলো নৃপেনবাবু অবসর নিয়েছেন। সকালে তাকে নীলিমাদেবীই ডেকে তুললেন। মনে করিয়ে দিলেন আজকে তার ব্যাংকে যাওয়ার দিন। এই পেনশনের টাকাতেই সারা মাসের সংসারটা চলবে। নৃপেনবাবু উঠে বসলেন, চা খেতে খেতে কোনো এক গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। হঠাৎ করেই নীলিমাদেবীর ডাকে হুশ ফিরলো। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। হাত মুখ ধুয়ে টিফিন করে বেরিয়ে পড়লেন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

পরিবারে নৃপেনবাবু আর তার স্ত্রী নীলিমাদেবী। তাদের একমাত্র মেয়ে পারমিতা তাদের সাথে থাকেনা। পারমিতা বাবা মার আপত্তি সত্ত্বেও হিন্দুমতে বিয়ে না করে কেবল কোর্ট ম্যারেজ করেছে। পারমিতার স্বামী সুরজিৎও এই বিষয়টিকে সমর্থন করে। কলেজজীবন থেকেই দুজনের প্রেম। সমাজের নানান অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার দেখে কলেজজীবন থেকেই তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছিলো। সেই পরিস্থিতি থেকেই দুজনে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমনস্ক আর যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। ওরা নিজেদের মধ্যেই নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা করে, তর্ক-বিতর্ক করে। পারমিতার মা নীলিমাদেবীর এইগুলো কোনদিনই পছন্দ ছিলোনা। তিনি তার বাবা মার শেখানো রীতি-নীতি, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার গুলোকেই এতদিন লালনপালন করে এসেছিলেন। তিনি চাইতেন তার মেয়ে পারমিতাও সেগুলো মেনে চলুক। কিন্তু, পারমিতা প্রায়ই মায়ের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়তো, বিজ্ঞান আর যুক্তির ওপর ভর করে পারমিতা নিজের পয়েন্ট অব ভিউ রাখতে চাইলেও শেষমেশ নিলীমাদেবী নানান কৌশলে মেয়েকে বেকায়দায়ওরা ফেলে জিতে যেতেন। নৃপেনবাবু এসব বিষয়ে বেশি মাথা ঘামাতেন না ঠিকই, কিন্তু তিনিও মনে মনে চাইতেন তার মেয়ের বিয়েতে কন্যাদান করবেন, মেয়েকে উপহার হিসেবে নানান আসবাবপত্র, সোফা, আলমারি দিয়ে শশুরবাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু, পারমিতা এইভাবে একজনকে বিয়ে করায় নৃপেনবাবু এবং তার স্ত্রী কেউই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি।

পারমিতা আর সুরজিৎ দুজনেই তাদের পরিচিত সার্কেলে যুক্তিবাদী আর বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবেই পরিচিত। দুজনেরই মত যে, বিয়ের পর কন্যাদান কেন হবে? কন্যা কি বস্তু নাকি?

বিয়ের পর ছেলে সিঁদুর, শাখা, পলা পরবে না, অথচ কেবল স্ত্রীকেই সেটা পরতে হবে। বাহ্যিকভাবে একজন মহিলা বিবাহিত এটা বোঝা গেলেও, একজন পুরুষও বিবাহিত এটা বোঝা যাবেনা কেন? কেন এরম বৈষম্য?

বিয়ের দিন সারাদিন উপোস করে থাকতে হবে, খিদে পেলেও খাওয়া যাবেনা, কেন?

বিয়ের দিন ছেলের মায়ের বিয়েতে যাওয়া নিষেধ। নিজের ছেলের বিয়েতে কেন একজন মা যেতে পারবেন না?

বিয়ের সময় বর আর কনে আগুনের চারিপাশে ৭ পাক ঘুরে ৭টি প্রতিজ্ঞা করে, ৭জন্মের জন্য তারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু, কোন কারণে মনের অমিল হলে ডিভোর্সটা সেই কোর্টেই হয়। ৭ জন্মের সমস্ত প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি সব ধুলোয় মিশে যায়। তবে কেন কেবল কোর্ট ম্যারিজই বিয়ের একমাত্র মাধ্যম হবেনা?

এরম একাধিক প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত জবাব কেউ দিতে পারেনি তাদের। কেবল "নিয়ম" বলেই সকলে এড়িয়ে গেছে। পারমিতা আর সুরজিৎ দুজনেই বিয়ের সময় মেয়ের বাবামায়ের নানান উপহার দেওয়াকেও একধরণের পণের চোখেই দেখে।

পারমিতা বর্তমানে একটি সাংবাদপত্রের উচ্চপদে আসীন আর সুরজিৎ একটি বেসরকারি ফার্মাসি কোম্পানিতে। পারমিতার শশুর বেঁচে নেই। তবে ওর শাশুড়ি এসব বিষয় নিয়ে পূর্বে ছেলে আর বৌমার সঙ্গে কথাকাটাকাটি, তর্কাতর্কি করলেও, এখন আর সেরম পরিস্থিতি নেই। ছেলে আর বৌমার সংস্পর্শে এসে তিনিও বাস্তবটা বুঝতে শিখেছেন।

বিয়ের পর পারমিতা অন্যত্র থাকলেও, ওর বাবা মার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রায় ৩-৪ বছর হতে চললো নীলিমাদেবী ধরেই নিয়েছেন তার কোনো মেয়ে নেই। তিনি এখনও জেদ ধরে আছেন, আর ভাবছেন নিয়ম করে বিয়ে না করায় ওদের সম্পর্কটা বেশিদিন টিকবেনা।

নৃপেনবাবু বেসরকারি একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বেতন যা পেতেন তাতে তাদের সকলের কোনোরকমে চলে যেত। এই পরিস্থিতিতে তিনি চেয়েছিলেন ভালো চাকরিওয়ালা, জাতের পাত্র পাওয়া গেলে মেয়েকে কলেজে পড়াকালীনই বিয়ে দিয়ে দেবেন। কিন্তু, পারমিতা ছিলো নাছোড়বান্দা। ওর ইচ্ছে ছিলো সাহিত্য নিয়ে মাস্টার্স করার, তারপর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের

পছন্দের কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে। বাবা মার তাতে সায় না থাকলেও, একরকম জেদের বশেই সে যুদ্ধ করে ওর মাস্টার্সটা শেষ করেছিলো।

নৃপেনবাবুর অবসরের পর বেসরকারি সংস্থা যে পেনশনের টাকাটা তাকে দিয়েছে সেটা খুবই সামান্য। সেই অর্থে দুজন মানুষের মাস চালানো প্রায় অসম্ভব। মাসের শুরুতে তিনি যে অর্থটা নিয়ে বাড়ি ফেরেন সেটা আদৌ ব্যাংকের থেকে উইথড্র করা অর্থ নয়। নীলিমাদেবীকে সেটা এখনও অবদি জানাননি নৃপেনবাবু।
গন্তব্যে এসে নৃপেনবাবু দাঁড়িয়েই ছিলেন, একটা ৪ চাকার এসইউভি এসে তার সামনে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে এলো একটি মেয়ে। একটা খাম নৃপেনবাবুর হাতে ধরিয়ে দিলো সে।
নৃপেনবাবুও এক গাল হেসে, " ভালো থাকিস মা " বলে মেয়েটিকে বিদায় জানিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন।
মেয়েটি গাড়িতে উঠে পড়লো। মেয়েটিকে সংবাদপত্রের অফিসে ফিরতে হবে যে।

নৃপেনবাবু না বললে নীলিমাদেবী হয়তো কোনোদিন জানতেও পারবেন না, ওই খামের কুড়ি হাজার টাকা আসলে তারই মেয়ে পারমিতার বেতনের অংশ।

বুমেরাং

- অরণ্য দাস

-- ওঠ বাবাই,না হলে স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।

-- আর একটুখানি মা।

-- না, আর এক ফোঁটাও না। এখন না উঠলে স্কুলের বাস পাবি না। আর তারপর স্কুলে স্যারদের বকুনি খাবি।

মায়ের কথাগুলি শুনে বাবাই শেষমেষ ঘুম থেকে না উঠে আর থাকতে পারলো না।সে এইবার তাড়াতাড়ি স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল।

খানিক পরে সে পোশাক পরে মা কে বলল--

-- মা ব্রেকফাস্টে কী আছে ?

-- তোর ফেভারিট ফুলকো লুচি আর ঘুগনি।নে এইবার চটপট এগুলো খেয়ে নে।

বাবাই তার প্রিয় খাবার গুলো পেয়ে গোগ্রাসে তা খেতে লাগলো।খাওয়া শেষ হওয়ার পরই ঘরের সামনে শোনা গেল স্কুল বাসের হর্ন। বাবাই ব্যস্ত হয়ে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বাসে চাপলো।তার মা চেয়ে দেখলো বাসটা ধোঁয়া উড়িয়ে বহুদূর চলে গিয়ে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এই ব্যস্ত শহরে অরূপ ও রূপসার ছোট্ট একটি সংসার। বাবাই তাদের একমাত্র ছেলে।ভালো নাম অনির্বাণ।অরূপের স্বপ্ন, সে তার ছেলেকে অনেক বড়ো করবে, মানুষের মতো মানুষ করবে।তাই সে একটা ছোট অফিসে কেরাণী হয়েও তার ছেলেকে নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করেছে৷ বাবাই এর যাতে কোনো কিছুর অভাব না হয় সেই দিকে তার সর্বদা সচেষ্ট দৃষ্টি। নিজের কোনো বিলাসব্যসন, বিনোদনের দিকে তার নজর নেই।তার সর্বদাই চিন্তা এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে কীভাবে তার পাওয়া স্বল্প বেতন থেকে তার ছেলের সমস্ত চাহিদা সে পূরন করবে।

বাবাই কোনদিন অভাবের একবিন্দুরও উপস্থিতি টের পায়নি।সে জানতেই পারে না তার মা বাবার কতটা স্বার্থত্যাগের ফসল হল ওই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এইভাবে দিন কাটতে থাকে। অরূপ ও রূপসার চোখের স্বপ্ন দিন দিন বৃহৎ থেকে বৃহত্তম হতে থাকে।এই অতিবৃহৎ স্বপ্নের কাছে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামী জীবনের দুঃখ কষ্ট নেহাতই ক্ষুদ্র মনে হয়।

এরপর সময়গঙ্গা দিয়ে বয়ে যায় বহু স্রোত।কত পাড় যে ভাঙল আর কত যে গড়ল তার কোন হিসেব নেই।

বাবাই আজ বড়ো হয়েছে। ছোট্ট চারাগাছ আজ মহিরূহে পরিনত হয়ে ডালপালা মেলেছে।সেই ডালে পাখির মত ঝাঁকে ঝাঁকে বাসা বেঁধেছে স্বপ্ন।

ছোট বেলা থেকে বাবাই বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে তার ভালো ফলাফল তার মা বাবার দেখা স্বপ্নকে আরও সুদৃঢ় করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে M.A. পাস করার পর সে তার বাবাকে বলল - বাবা আমি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চাই,তার জন্য পাঁচ লাখ টাকা দরকার।

অরূপ তার ব্যাঙ্কের পাঁচ লাখ টাকার সমস্তটাই তুলে দিল ছেলের হাতে। একবারও তার মনে হয়নি তার শেষ সম্বল এই পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেলে সে ও তার স্ত্রী কীভাবে দিন কাটাবে।কারন সে জানতো তার ছেলে একদিন ঠিক মানুষের মত মানুষ হবেই।

এরপর বাবাই তিন বছরের জন্য বিদেশে চলে গেল।তার মা বাবা তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় বুক বেঁধে বসে রইল।

দেখতে দেখতে তিনটে বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল।এখন অরূপ আর রূপসার বয়স বেড়েছে। অরূপও এক বছর হল অফিস থেকে রিটায়ার্ড হয়েছে। বিদেশ থেকে MBA করে ফিরে বাবাই অর্থাৎ অনির্বাণ বোস এখন কোলকাতার এক নামজাদা কোম্পানির CEO. অরূপ আর রূপসার দেখা বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্ন আজ সত্যি। তাদের ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করতে চাওয়া

প্রচেষ্টা আজ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অমাবস্যার পরে প্রতিপদের চাঁদের ফিকে আলো যেমন গুমোট অন্ধকারের হাত থেকে পৃথিবীকে টেনে তোলে সেই রকমই দারিদ্র্যের হাত ছাড়িয়ে অরূপ আর রূপসার পৃথিবীতে দেখা গেল সুখের দীপ্তি।

এক বছর পর অনির্বাণ বিয়ে করল। দু'বছর সুখে বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করার পর তার এখন একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। অনির্বাণের স্ত্রীও চাকরি করে। তাদের ছেলে তার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার স্নেহেই পালিত হতে লাগল।

অরূপ আর রূপসার বয়স এখন যথাক্রমে আশি ও পঁচাত্তর। ছেলের জন্য তাদের গর্বে সবসময় বুক ফুলে থাকে। সেই সব আত্মীয়-স্বজন আজ তাদের দুজনকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের চোখে দেখে যারা এক সময় মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল - ছেলেকে এত পড়িয়ে কি হবে? ডাক্তার না ব্যারিস্টার?

একদিন অনির্বাণ বাবাকে বললো-- বাবা একটা কথা ছিল।

-- হ্যাঁ, বল।

-- বলছিলাম যে তুমি আর মা যদি অন্য কোথাও গিয়ে থাকো তাতে কি তোমাদের কোন আপত্তি আছে?

-- কেন বাবাই? হঠাৎ তুই এইরকম কথা বলছিস? আমাদের জন্য কি তোদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

-- তা ঠিক নয়। আসলে তোমরা হলে একটু পুরোনো দিনের, ওই যাকে বলে ব্যাক ডেটেড। এই সমাজে আমার অনেক নামডাক আছে। গত পরশু বাড়িতে যে পার্টিটা হয়েছিল সেখানে তোমাদের বড্ড বেমানান লাগছিল। আমার তো সবার কাছে তোমাদের পরিচয় দিতেই লজ্জা লাগছিল। তাছাড়া আমার ছেলে বড় হচ্ছে, তার জন্য ওই পশ্চিমের ঘরটা, যেখানে তোমরা থাকো সেইটা চাই। তাই বলছিলাম তোমরা যদি এখন একটু বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থাকো।

-- কি বললি! আমাদের পরিচয় দিতে তোর লজ্জা করে? তোদের সঙ্গে আমরা বেমানান! হায় ভগবান! আমি কি তোকে এইরকম মানুষ করতে চেয়েছিলাম? কথাগুলি বলতে বলতে বৃদ্ধ অরূপের চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

দুপুরে খাবার পর অরূপ তার স্ত্রীকে ডেকে সমস্ত কথা বলল। সেই শুনে তার স্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেল। খানিক পরে তারা দুজনে ঠিক করলো, ছেলেই যদি না চায় তারা বাড়িতে থাকুক তখন তারা আর এই বাড়িতে থাকবে না।

পরের দিন বুকে পাথর রেখে তারা বাড়ি ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হল। তাদের নাতি অংশু খুব কাঁদছিল আর বলছিল - দাদু , ঠাম্মা তোমারা যেয়ো না। কিন্তু যেই বিহঙ্গকে পিঞ্জর থেকে দূর করে দেওয়া হয় সে কি আর পিঞ্জর পানে চায়! যাওয়ার সময় তাদের বারবার মনে পড়তে লাগলো বাবাইয়ের ছোট্টবেলার কথা।বাবাই এর জন্য তারা কিনা করেছে।বাবাই কে বড়ো মানুষ করবে বলে তারা তো তাদের সমস্ত সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছিল। কিন্তু সেই বাবাই কিনা আজ তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। হায়রে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ! এই কি তবে মনুষ্যত্ব! নারির টানই যখন ছিন্ন হয়ে যায় তখন কি আর আসে যায় দৈহিক দুঃখ কষ্টে।

অরূপ আর রূপসার ঠিকানা এখন বৃদ্ধাশ্রম।এই বৃদ্ধাশ্রমই শত শত বাবাইয়ের মা বাবার অন্তিম ঠিকানা, শেষ আশ্রয়স্থল। তাদের চোখেও কোনদিন ছিল ছেলেকে বড়ো করার স্বপ্ন, কিন্তু তারা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেনি ছেলে বড়ো হলে তাদেরকে ছেলের কাছে ছোট হতে হবে, হতে হবে সংসারের বোঝা, তাদের থেকেও বাড়ির পোষ্য কুকুরটার আদর আপ্যায়ন হবে বেশি। মাঝে মাঝে অতীতের স্মৃতি তাদের চোখে নামিয়ে দেয় অকাল বর্ষা। যার জলে ধুয়ে যায় দুঃখ কষ্টের আবর্জনা। শুধু থেকে যায় তার ছাপটুকু। এইভাবেই বৃদ্ধাশ্রমে দিন কাটাতে কাটাতে একদিন অরূপ ও রূপসা ইহজগতের সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেল।

এরপর পৃথিবীর অমোঘ নিয়মেই কেটে যায় বহু বছর।বাবাই মানে মিঃ অনির্বাণ বোস এখন ৭০ বছরের বৃদ্ধ। তার ছেলে অংশুমান এখন বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার।সে কলকাতার PWD ডিপার্টমেন্টের হেড ইঞ্জিনিয়ার। সেও বিয়ে করেছে এবং বর্তমানে একটি পুত্র ও কন্যা সন্তানের অধিকারী।

হঠাৎ একদিন অংশুমান তার বাবাকে ডেকে বলল - বাবা কিছু কথা ছিল।

-- দেখ বাবা তোমার বৌমা বলছে ,ও আর তোমাদের দেখভাল করতে পারবে না। তোমরা অন্য কোথাও গিয়ে থাকো।তাছাড়া আমাদের স্টেটাস এখন খুব হাই।তোমরা আমাদের সঙ্গে মানাতে পারবে না।আর তোমাদের জন্য সমাজে , বন্ধুদের কাছে আমার নাক কাটা যাবে।তোমরা বরং বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থাকো।আমি না হয় মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।

কথাগুলো শুনে বৃদ্ধ অনির্বাণ ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। তার কানে বাজে ছেলের বলা কথাগুলো। তার কন্ঠনালী রুদ্ধ হয়ে আসে। হঠাৎ তিনি ফিরে যান ৪০ বছর আগে। তার মনে পড়ে যায় ঠিক এইরকমই কথাই তিনি বলেছিলেন তার মা বাবাকে।তখন তিনি বুঝতে পারেননি ঠিক কি রকম বিধ্বংসী ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার বাবা মার মনের উপর দিয়ে।আজ তিনি তার উপলব্ধি করতে পারছেন।৪০ বছর আগে তারই বলা কথাগুলো আজ বুমেরাং এর মত ফিরে এসে শেলের মত বিঁধেছে তার বুকে।তার চোখের কোন থেকে নেমে আসে অশ্রুধারা।এই অশ্রুধারা তার মা বাবাকে ৪০ বছর আগে বাড়ি থেকে বের করে দেবার অনুতাপের।এই জগতে কর্মফল বলে এক বিষম বস্তু আছে যার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই।সকল পুত্রই ভুলে যায় সেও একদিন পিতা হবে, হয়তো তার পুত্রও তার সঙ্গে এই রকম দুর্ব্যবহার করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথাকথিত বড়ো মানুষের মুখোশ ও বিলাসী সমাজের মায়া চাদরে ঢাকা তাদের চোখ জগতের এই নির্মম বাস্তবের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

শেষ ইচ্ছা

-জামাল আনসারী

.

পৃথিবীতে মানুষের জনসংখ্যা প্রতিদিনই ভরা বর্ষায় উত্তাল গঙ্গা নদীর জলপ্লাবনের মতো বাড়লেও সেই মানুষ গুলির মধ্যে দৈহিক মিল যেমন নেই, তেমনি তাদের আচার -ব্যবহার, রীতি নীতি, খাদ্যাভ্যাস, এমনকি সবার ইচ্ছা ,আকাঙ্ক্ষাও তারতম্য আমাদের চোখে খুবই প্রকট রূপে ধরা পড়ে।আপাত দৃষ্টিতে, খালি চোখে, প্রতিটি মানুষেই দেখতে অন্য মানুষেরই প্রতিচ্ছবি মনে হতেই পারে।কিন্তু মনে হলেও আমরা কার মনে কি আছে? তা কি জানতে পারি? বলতে গেলে আমরা কেউই নিজের মনে কি আছে, বা আমি কি ভাবছি ...শতচেষ্টা করেও তারই কুলকিনারা খুঁজে উঠতে পারি নি ,তারপর আবার অপরের মনের কথা বোঝা! খুব ভালো ভবিষ্যৎ বক্তাও বোধ হয় বলতে পারবে না।

গাছ থেকে পাকা ফল পড়লেই কি সেই পাকা ফল থেকে তখনই নতুন চারা গাছের জন্ম হয়? তা হয়তো সাথে সাথেই হয় না। তবে এ কথা সত্য, সেই ফলের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় আগামীদিনের নতুন গাছ ঘুমিয়ে থাকে। আলো,বাতাস,উত্তাপের সংস্পর্শে উপযুক্ত আবহাওয়ায় অঙ্কুরোদগম এর মাধ্যমে তা বিকশিত হয়।

নতুনডি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহিদুল ইসলামেরও একটি ইচ্ছা দীর্ঘ আটাশ বছর চাকুরী কালব্যাপি সুপ্তই ছিল। এতদিনের সুপ্ত ইচ্ছাটা যে কি! তা তার একমাত্র সহ ধার্মিণী সালমা বিবি কেন,কাক পক্ষীও কোনদিনই জানতো না।

সেদিন মঙ্গলবার। অকালে মা মরা সাবিনাকে হাতে ধরে হাঁটতে হাঁটতে সালমা বিবি গ্রামের শেষ প্রান্তে গজিয়ে ওঠা বিশাল প্রাসাদসম ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পৌঁছে দিতে চলে গেল।যদিও বাড়ি থেকে স্কুলের দুরত্ব খুব একটা বেশি নয়।পাঁচশো মিটারের মতো হবে। সাবিনা একা একা যেতেও পারবে। কিন্তু কেউ ঠিক করে জানে না, যে কি গূঢ় রহস্যময় কারনে সবারই বাড়ির অবিভাবকরা তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেয়। তাই সাবিনাকেও তারা পৌঁছে দেয়। মহিদুল হিসেব করে দেখে,তার স্ত্রীর স্কুল থেকে ফিরে আসতে মিনিট কুড়ি লাগবেই। বাড়িতে আর কেউ নেই।বিছানার তলা থেকে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাস বইটা আস্তে আস্তে টেনে বের করে মহিদুল। তারপর একটু ইতস্তত করে, জানলার দিকে একটু উঁকি মেরে, কেউ ধারে পাশে নেই, এটা নিশ্চিত হলেও সদর দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।কিন্তু দরজায় খিল দেয় না।দড়ি বাধা মোটা কাঁচের চশমাটা চোখে দিয়েই, ব্যাঙ্কের পাসবইটা হাতে নিয়ে ভালো করে উল্টে পাল্টে দেখে।

মনের আনন্দে অস্ফুট স্বরে বলে উঠে, আর মাত্র কুড়ি হাজার টাকা! তারপরই সে হজ যাত্রা করতে পারবে। তাঁর আর কোনো চিন্তা নেই! বলেই আবার যথাস্থানে ব্যাঙ্কের পাসবইটা রেখে দেয়। দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখে তার সহ ধার্মিণী চৌকাঠ ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। আদালতে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে , বিচারক যখন ফাঁসির আদেশ পড়ে শোনায় তখন আসামির মুখটা যে রকম পাংশু বর্ণের দেখতে হয় , মহিদুলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তার কি করণীয় তা ক্ষনিকের জন্য হলেও বিস্মৃত হয়।

সালমা বিবি স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কৌতূহল দৃষ্টিতে বলে, হ্যাঁ গো তুমি কি সত্যিই মক্কায় হজ করতে যাবে?

...হুম।যাবো। বিহ্বলভাব কাটিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলে মহিদুল।

কিছু কিছু তীর্থস্থান এই ধরাধামে আছে। ধার্মিকদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে একবার পৌঁছাতে পারলে তার স্বর্গের প্রবেশদ্বার কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক মহিদুল ইসলামও অন্য আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই সেই বিশ্বাসকে দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে অন্তরের অন্তিম স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। তাই সুদীর্ঘ চাকুরিকাল ব্যাপী সংসারের সমস্ত দায় দায়িত্ব পালন করেও তিল তিল পরিমান টাকা বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই টাকা আজ ব্যাঙ্কে জমা হতে হতে দুই লাখ আশি হাজার হয়েছে।

সালমা বিবি আর চৌকাঠ না ধরে রেখে স্বামীর কাছে আস্তে আস্তে আসে। সু সজ্জিত পালঙ্কের উপর বসতে বসতে একটু হেঁয়ালী করে বলে, সে তো অনেক টাকার ব্যাপার! আমাদের মতো আদর ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে কাজ কি?

.... স্ত্রীর প্রশ্নটির উত্তর এড়িয়ে মহিদুল আদরের স্বরে বলে,জানো সালমা। যতদিন চাকুরী করেছি। ততদিন শুধু আমাদের দুই মেয়ের লেখাপড়া, তারপর ভালো ঘর, ভালো বর, দেখে বিয়ে দেওয়া। আপামর বাঙালির মতো আমিও সেই স্বপ্নই দেখেছি। সে কাজ আমি সাফল্যের সাথে সমাধান করেছি.....

গর্বভরে প্রসন্ন চিত্তে সালমা বিবি জানায়, সে কথা জানি। আমাদের বড় মেয়ে নার্স হয়েছে। আর ছোট মেয়ের জামাই তো তোমার মতোই স্কুলের ....

মহিদুল তার স্ত্রীকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে শুষ্ক মুখে একটু হেসে বলে, সে নিয়ে আজ আর আমার কোনো দুঃখ, বা কষ্ট নেই। তবে...

....তবে কি? স্বামীর চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখটা নিচু করে তাড়াতাড়ি বলে সালমা বিবি।

মহিদুল তার স্ত্রীর হাতটা টেনে, নিজের উরুর উপরে ধরে হাতটি রাখে।সালমা বিবির নিচু করে রাখা মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার এতদিন সব ইচ্ছেই আল্লাহ পূর্ন করেছে। শেষ ইচ্ছা একবার মক্কায় হজ করতে যাওয়া। বেশ এই টুকুই আমার শেষ ইচ্ছা।এটা আমার অনেকদিনের স্বপ্নও বলতে পারো! কখনোই আমি তা প্রকাশ করি নি। আজ শুধু তোমাকেই বলছি।

..মুখটা তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকায় সালমা বিবি।তারপর দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া মাগে, হে আল্লাহ!তুমি আমার স্বামীর শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করো।বলেই স্বামীর পালঙ্ক থেকে উঠে যায়।

(2)

সাবিনার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন তার মা ইহলোকের সমস্ত মায়া মমতার বন্ধন ছিন্ন করে, সাবিনাকে মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করে, সেই অসীমলোকে ,না ফেরার দেশে চলে যায়। অবশ্য তার মায়ের আজ দোষ দেওয়া বৃথা। মমতাময়ীর কোন যথার্থ দোষ ছিলও না।সাবিনার পাষণ্ড, হৃদয়হীন,মদ-মাতাল বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, একদিন তার মা আত্মহত্যা করেই ,পার্থিব জগতের সমস্ত অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ পায়।কিন্তু তার সাবিনা? .....

সাবিনার বাবা কতটা হৃদয়হীন, সেটা আরো স্পষ্ট করে প্রতিবেশীরা বুঝতে পারে, যখন তার মরা বউয়ের চল্লিশা, মানে 40 দিন পার না হতেই শহরের এক সুন্দরী মেয়েকে বউ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা কেউ কেউ আবার বলে, সারা পৃথিবীতে খোঁজ করলেও নাকি এই রকম পাষণ্ড বাপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল! কেউ কেউ আবার ফিসফিসিয়ে বলে, শহরের এই সুন্দরী মেয়েটার জন্যই নাকি সাবিনার মা মরতে বাধ্য হয়েছে।

সে যে যাই বলুক না কেন। সাবিনা তাদের কথায় কোন কান দেয় না। সে নতুন মা পেয়ে সেদিন খুশিই হয়েছিল। সে প্রথমে ভেবেছিল তার নিজের মা না থাকলেও নতুন মা তাকে মাতৃস্নেহে আদর যত্ন করে, মায়ের মতই ভালো বাসবে।

কিন্তু তার সেই আশা আর পূর্ণ হল না। কিছুদিন যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারে, এই বাড়িতে তার আর কোন অধিকার নেই, আবদার করার জোও নেই।এখন কথায় কথায়, উঠতে বসতে সৎ মা তাকে মারধর করে।

সে বাবাকে নালিশ করলে মারধরের মাত্রাটা আরো বৃদ্ধি পায়।তাই সে চুপ করে,মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে যায়।কিন্তু তাঁর জীবনটা এই কিছুদিনেই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।যেদিন সাবিনা প্রথম উপলব্ধি করে যে, তাকে তাঁর জান্নাতবাসী মায়ের রাস্তায় অবলম্বন করতে হবে।তা ছাড়া আর কোনো রাস্তাই এখন খোলা নেই।সেদিনই তাঁর মামা মহিদুল ইসলাম প্রতিবেশীদের কাছে সবকিছু জেনে শুনে সাবিনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়।

তারপর আজ পর্যন্ত সাবিনা আর নিজের বাবার বাড়ি দিকে ফিরেও তাকায় না।মহিদুল তার ভাগ্নিকে নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসে। নতুনডি গ্রামের একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সে ক্লাস ফোরে এখন পড়াশোনা করে।

(3)

বাঙালিরা মাছ খেতে খুব ভালোবাসে কিন্তু খেতে খেতে যদি মাছের কাঁটা গলায় বিদ্ধ হয়। কেমন লাগে? সে অনুভূতি বোধ হয় যার গলায় মাছের কাঁটা লেগেছে, সে ছাড়া আর অন্য কেউ জানে না। যতক্ষণ না সেই কাঁটা গলা বেয়ে উদরে প্রবেশ করছে ততক্ষণ সেই মাছের কাঁটার কথায় সে মনে মনে চিন্তা করে যায়।মহিদুলেরও যতদিন না হজযাত্রা সফল হচ্ছে, একটাই চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে নদীর জলতরঙ্গের মত এসে ধাক্কা মারছে।কিছুতেই সে ঐ চিন্তা ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারছে না।

মহিদুল পড়ার টেবিলে ঝুঁকে ফাইবারের চেয়ারে বসে পাসপোর্ট এর জন্য ফরম পূরণ করছে।কিছুটা পূরণ করে রান্না ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়...সাবিনা!

সাবিনা ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে বসে ড্রইং এর খাতার উপর রঙ পেনসিল দিয়ে একটা মক্কার ছবি অঙ্কন করছে। মামার গলার স্বর কানে যেতেই পেন্সিলটা নামিয়ে জোর গলায় বলে,

মামা।আমায় ডাকছো?

হুম।এক গ্লাস খাবার জল আনো তো মা।

সাবিনা যেদিন থেকে মামার বাড়ি এসেছে,সেদিন থেকেই এই বাড়ির ছোটখাটো কাজ গুলো মনের আনন্দে সে নিজেই করে।মামা বা মামী কেউ তাকে কাজ করতে বাধ্য করেনি।তাঁর কাজ করতে ভালো লাগে, তাই সে করে। সাবিনা ফ্রিজ খুলে বোতলে রাখা ঠান্ডা জল একটি কাঁচের গ্লাসে ভরে। ফ্রিজটি লাগিয়ে ঠান্ডা জলের গ্লাসটা মামার হাতে তুলে দিয়ে চুপচাপ অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মহিদুল এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের সবটুকু পানীয় নিঃশেষ করে, খালি গ্লাসটা সাবিনার দিকে বাড়িয়ে বলে,..

যা একটু জল দিয়ে ধুয়ে, রেখে দে।

মহিদুল এই ছোট্ট ভাগ্নিটিকে নিজের মেয়েদের থেকে একটু বেশিই ভালোবাসে।হয়তো বা মেয়েটির কোন মা নেই তাই।তাছাড়া এটাও হতে পারে, সাবিনার বাবা থাকলেও সে বাবা থাকা না থাকা দুই-ই সমান বলে।।সাবিনার বয়স কম হলে কি হবে ! সে কাজে যেমন লেখাপড়াও তেমনি সমান পারদর্শী।কোন কাজ একবার তার মামিকে করতে দেখলেই সে নিজেও সে কাজটা অনায়াসে করতে পারে।পাসপোর্ট এর ফর্ম টা পুরোটা ফিলাপ করে ফর্মের একেবারে নিচে স্বাক্ষর করতে করতে মহিদুল আবার ডাক দেয়,...সাবিনা।

সাবিনা মক্কার ছবিতে লাস্ট ফিনিশিং এর রং করতে লেগেছে।সেটা হাতে তুলেই সে বলে ..কি মামা ?কিছু বলছো ?

-হ্যাঁ। তোর মামী আছে তো একবার ডাক দেখি।দরকার আছে।

সাবিনা খাতাটা হাতে নিয়েই রান্নাঘরে গিয়ে মামীকে ডেকে, সঙ্গে নিয়েই মামার কাছে চলে আসে।

মহিদুল হাতে ধরা কলমটা ফিলআপ করা পাসপোর্ট এর ফর্মের উপর রেখে তার স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে বলে ,আগামীকালই আমি ফর্মটা পাসপোর্ট অফিসে জমা দিয়ে দিচ্ছি।আশা করি কয়েকদিন পরেই কাজ হয়ে যাবে।

সালমা বিবি কিছু না বলে শুধু একটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দেই।

কিন্তু সাবিনা কৌতূহলের সঙ্গে বলে,ওটা কিসের ফরম মামা?

... তুই বুঝবি না মা।

...কেন বুঝবো না? বুঝিয়ে দিলেই বুঝবো মামা।সাবিনা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

ক্লাসে শিক্ষক যেভাবে ছাত্রকে বোঝায় সেভাবে মহিদুল সাবিনাকে বোঝায়,...

যারা নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে কোন কাজের জন্য যায় ,তাদের পাসপোর্ট ভিসা লাগে। এই পাসপোর্ট ছাড়া কিছুতেই অন্য দেশে কেউ যেতে পারে না।

..কিন্তু মামা সেটা তোমার কি কাজে লাগবে?সাবিনা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

.. দূর পাগলি! তোকে তো বলাই হয় নাই। আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে কিছুদিন পরেই সৌদি আরবের দেশে মক্কায় হজ করতে যাব।তাই....

সালমা বিবি হঠাৎ স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে বলে, একে বুঝিয়ে কাজ নেই।তুমি বরং মাথা ঠান্ডা করে কি কি করতে হবে সেগুলো করো। বলেই ঈগল পাখি যেভাবে শিকার ধরে সেভাবে চোখের পলকে সাবিনাকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।কিন্তু ড্রইং এর খাতাটা ভুলবশত সাবিনা টেবিলের উপরই রেখে চলে যায়।

মুহিদুল টেবিলের ওপর ফর্মটা হাতে তুলতে গিয়েই ড্রইং এর খাতায় সাবিনার কচি হাতে সদ্য অঙ্কন করা মক্কার ছবিটার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।ছবিটা দেখে,মহিদুল দুহাতে তুলে বুকে জড়িয়ে নেয়।পরম আনন্দে দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।তা মহিদুল ঠিকই টের পায়।

ইসলাম বলছে ,হজ মুসলমানদের জন্য একটি অবশ্যকরণীয় ইবাদত। এটি ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভও বটে।তবে সবার জন্য হজ ফরজ নয়। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম হলে তবেই হজ করা ফরজ।একদৃষ্টে মক্কার ছবিটার দিকে তাকিয়ে মহিদুল বলে ,এতদিন এখানে যাব যাব করেও আর যাওয়া হয় নি। টাকার অভাব ছিল।আজ আর কোন অভাব নেই।এবার যাওয়া হবেই.... মহিদুলের চোখের সামনে মক্কার ছবিটা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে।

(4)

সকালে ঘুম থেকে উঠে সালমা বিবি স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছে আজ পাসপোর্টের ফর্মটা অফিসে জমা দেওয়ার কথা।তাই মহিদুল স্নান করে, খেয়ে দেয়ে, সকাল ন,টার মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়।দরকারি জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে দেখে সাবিনাও তার স্কুলে যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছে।তাই মহিদুল তাঁকে কাছে ডেকেই বলে, সাবিনা চল! আজ আমি তোকে স্কুলে পৌঁছে দিই।

..মামার কথায় সাবিনা রুক্ষ চুলের দুদিকে ফুলবাধাঁ বেণী দুলিয়ে খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

কাঁধে ব্যাগ নিয়ে এক হাতে সাবিনার কচি নরম হাতটি ধরে হেঁটে হেঁটে মহিদুল প্রথমেই ভাগ্নির স্কুলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।তারপর ভাগ্নিকে স্কুলে ছেড়ে সেখানে বাস ধরে পাসপোর্ট অফিসে যাবে।সেই মতো কিছুটা হাঁটার পর সাবিনা থমকে দাঁড়ায়। মহিদুল দেখে, রাস্তার ধারে জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরা,ছেঁড়া আসনে বসা, একটি ভিখারিকে সাবিনা স্কুল ব্যাগ থেকে দুটি টাকা বের করে দেয়। অবশ্য সাবিনা শুধু আজ নয়, প্রতিদিনই স্কুল যাওয়ার পথে এই দুটি টাকা দান করে, মনে মনে এক অসীম সুখ অনুভব করে।ভিক্ষারীর মলিন মুখে হাসি ফুটিয়ে, মামার হাত ধরে আবার হাঁটা শুরু করে।

হাঁটতে হাঁটতে সাবিনা বলে, জানো, মামা। স্কুলের নতুন দিদিমণি একটা গান শিখিয়েছে!

... ভাগ্নির ধরে থাকা কচি হাতটা নাড়িয়ে দিয়ে মহিদুল বলে,.. কি গান রে ?একটু বল,শুনি।

.. তৎক্ষণাৎ উৎসহভরে দিদিমনির কণ্ঠ নকল করে, সে হাঁটতে হাঁটতে গানটি গেয়ে চলে..

" জীবন জীবনের জন্যে,
মানুষ মানুষের জন্যে ,
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?
ও বন্ধু....
মানুষ মানুষের জন্যে,
জীবন জীবনের জন্যে।
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?"

না। সাবিনা গানটি আর শেষ করতে পারে না।একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাবিনাকে সজোরে ধাক্কা মারে। সে পিচ রাস্তার উপরেই লুকিয়ে পড়ে। তার স্কুল ব্যাগটি দূরে ছিটকে গিয়ে এই দৃশ্যের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পরনের স্কুলড্রেস রক্তে লাল হয়ে সেই রক্ত কালো পিচের উপরে গড়িয়ে যাচ্ছে। মহিদুল কখনোই এত তাজা রক্ত দেখেনি। তাই ভয় পেয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।ক্ষনিকের ঘোর কাটিয়ে লোকজনের সহযোগিতায় নিকটবর্তী নার্সিংহোমে ভাগ্নিকে ভর্তি করে।চোখের জল মুছতে মুছতে ডাক্তারের কাছে, করজোড়ে অনুরোধ করে, আমার ভাগ্নি কে বাঁচান ডাক্তারবাবু।আমার ভাগ্নি কে বাঁচান.....

ওটি রুমের পাশেই মহিদুল নিথর পাথরের মূর্তির মতো একা দাঁড়িয়ে থাকে। এক মনে শুধু আল্লাহকে ডাকে।কিছুক্ষণ পরে ওটি থেকে ডাক্তার বেরিয়ে মহিদুলকে আশ্বস্ত করে বলে, পেসেন্টের মাথায় খুব জোরে আঘাত লেগেছে। এখনো জ্ঞান ফেরেনি।
... ডাক্তারবাবু ওকে বাঁচান। ডাক্তারবাবু ওকে বাঁচান। ....হাতজোড় করে বলতে থাকে মহিদুল।
..24 ঘন্টা না কাটলে কিছুই বলা যাবে না।এই বলে ডাক্তার নিজের কাজে চলে যায়।

24 ঘন্টা পর সাবিনার একটু জ্ঞান ফেরে।সে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে। কাউকে ঠিক চিনতেও পারে না। ডাক্তার মহিদুলকে কাছে ডেকে জানায়, পেশেন্টের মাথায় জটিল অস্ত্রোপচার করতে হবে।অনেক টাকার দরকার হতে পারে।
বাড়ির কাছাকাছি বাজ পড়লে যেমন আমাদের চোখ ক্ষণিকের জন্য হলেও তীব্র আলোকে স্তব্ধ হয়ে যায়, তেমনি ডাক্তারের কথা শুনে মহিদুল স্তব্ধ হয়ে যায়। চারদিকে ঝাপসা দেখে।অনেক টাকার দরকার। সে কোথায় এখন এত টাকা পাবে? কে তাকে এই দুর্দিনে এত টাকা দেবে ?তারপর ভাবে, তাঁর তো টাকা আছেই।
না।না।সে টাকা তো হজ করতে যাওয়ার টাকা! দীর্ঘ আটাশ বছর ধরে একটু একটু করে সঞ্চিত করে, সেই টাকা হয়েছে।সেই টাকা ডাক্তারবাবুকে দিলে তার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যাবে।না।সেটা কখনোই হতে পারেনা।
সে আর ভাবতে পারে না।মাথা ঘুরতে থাকে।সাবিনার কণ্ঠে গাওয়া গানটার কথা মহিদুলের বারবার মনে পড়ে,"মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে.......
একদিকে তার শেষ ইচ্ছা হজ করতে যাওয়া, অন্যদিকে তাঁর একমাত্র আদরের ভাগ্নি সাবিনার জীবন বাঁচানো। কোন কাজটা তাঁর এই সময় করা উচিত? সে কিছুই ভেবে পায় না।
মা মরা মেয়ে সাবিনার মুখটা বারবার মহিদুলের চোখে ভেসে ওঠে।সে হয়তো চিৎকার করে বলছে,"মামা আমাকে বাঁচাও।আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচতে দাও।টাকা থাকতেও আমি কি তাকে বাঁচাতে পারি না?
না। না।.....এ আমি কি করছি ? "
মহিদুলের মাথাটা যেন কেমন করে উঠে।সে সাবিনার আর্তচিৎকার স্পষ্ট শুনতে পায়। না, আর এক বিন্দু সময়ও নষ্ট করতে চাই না আমি।ছুটে গিয়ে ডাক্তারকে করজোড়ে জানিয়ে দেয়,অনেক টাকা খরচা হলেও সেই টাকার জন্য চিন্তা করবেন না ডাক্তারবাবু। যত টাকা দরকার হয়, আমি দেবো।শুধু আমার ভাগ্নি কে বাঁচান। আমার ভাগ্নি কে বাঁচান...
... ঠিক আছে, আমরা চেষ্টা করে দেখব। ভেঙে পড়বেন না।শান্ত হোন।বলেই ডাক্তারবাবু ওটি তে চলে যায়।

দীর্ঘ 15 দিন ধরে যমে মানুষে টানাটানির পর মহিদুল ইসলাম প্রায় লাখ তিনেক টাকার বিল মিটিয়ে সাবিনার মুখে হাসি ফুটিয়ে নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এলো।মহিদুলের শেষ ইচ্ছা পূর্ন না হলেও আজ আর তাঁর মনে কোন দুঃখ নেই।সে একজনের জীবন বাঁচাতে পেরেছে ..এটা ভেবেই এখন গর্ব অনুভব করে।মহিদুল সাবিনার হাতটি ধরে ভূপেন হাজারিকা-র গাওয়া "মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে,.গানটি... আজ মামা ভাগ্নি একসাথে গাইতে গাইতে নতুনডি গ্রামের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

অণু গল্প

একটা ঝাঁটা,এক চোখ ও ফোয়ারার ভুল অঙ্ক

-উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোয়ারার আজ ক্লাস টেস্ট আছে। টিচার বলেছেন,এক মিনিট দেরি হলেও ওকে ঢুকতে দেবেন না।ফোয়ারা ঘুম থেকে উঠতে দেরি করে। তাবলে বাচ্চা কে ঢুকতে দেবনা? এ কেমন কথা!খুব ভয়ে পেয়েছে মেয়েটা।পুলকার এসে যাবে।দুগ্গা দুগ্গা বলে ফোয়ারার হাত চেপে ধরে নীচে নামতে গিয়েই বিপদ।ঝাঁটা হতে উঠে আসছে মানদা। সক্কাল সক্কাল ঝাঁটা!কেন রে বাপু!ফোয়ারার দুটো চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে যাও বা পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করলো তিয়াস,সে গুড়েও বালি।গেটম্যান এক চোখ বন্ধ করে খৈনি ডলছে।

এরা কারা!রাগে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েকে পুলকার এ তুলে দিয়েই সে চিৎকার করে মান দা আর গেটম্যান এর পিন্ডি চটকাতে থাকে।তাতে আর কী!স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে ফোয়ারা।একটা জানা অঙ্ক সে ভুল করে এসেছে।ওর কোন দোষ নেই।যত দোষ, নন্দ ঘোষ,থুড়ি,ওই ঝাঁটা আর এক চোখ।
